



ধা রা বাহিক উপন্যাস

ক্ষেম

হুমায়ুন আহমেদ

পর্ব ১

‘দেয়াল’-এর গঞ্জ উক হবে ১৯৭৫ সনের এক তাত্ত্বিক সন্ধায়। আকাশ মেঘাজ্জন, বৃষ্টি নামবে নামবে করছে। আকাশে অঙ্গুষ্ঠা, দেশের মানুষের মধ্যেও অঙ্গুষ্ঠা। অঙ্গুষ্ঠার কারণ স্পষ্ট না। আনন্দে আছে শিখরা। ধূমমণির বাত্রিশ নম্বর সংকেরে একটি শিখকে তার মা ফুটবল কিনে দিয়েছে। ফুটবল দু'হাতে বুকের কাছে ধরে সে ছোটাছুটি করছে। সে তার বাবার সঙ্গে ফুটবল খেলবে। বাবা এখনো বাসায় ফেরেন নি বলে খেলা উক হয় নি। শিখটির নাম শেখ রাসেন।]

শিখক পরপর দু'কাল চা খেয়েছে। দোকানিকে টাকা দিতে গিয়ে দেখে সে মানিব্যাগ আনে নি। এরকম ভুল তার সচরাচর হয় না। তার আরেক কাপ চা খেতে ইচ্ছা করছে। চায়ের সঙ্গে সিগারেট। শিখক মনস্থির করতে পারছে না। সঙ্গে মানিব্যাগ নেই—এই তথ্য দোকানিকে আগে দেবে নাকি চা-সিগারেট খেয়ে তারপর দেবে!

শিখকের হাতে বিভিন্ন ঘণ্টের একটা উপন্যাস। উপন্যাসের নাম ইচ্ছামতি। বইটির ছিতীয় পাতায় শিখক লিখেছে— অবস্থিকে ওভ জন্মদিন। বইটা নিয়ে শিখক বিশ্বাস অবস্থায় আছে। বইটা অবস্থিকে সে দিবে নাকি ফেরত নিয়ে যাবে? এখন কেন জানি মনে হচ্ছে ফেরত না নেওয়াই ভালো।

অবস্থির বয়স ঘোল। সে ভিকারননিসা কলেজে ইন্টারমিডিয়েটে পড়ে। শিখক

তাকে বাসায় অংক শেখায়। আজ অবস্থির জন্মদিন। জন্মদিনের অনুষ্ঠানে শিখককে বলা হয় নি। অবস্থি ওধু বলেছে, তের তারিখ আপনি আসবেন না। ওই দিন আমাদের বাসায় ঘৰোয়া একটা উৎসব আছে। আমার জন্মদিন।

যে উৎসবে শিখকের নিমস্ত্রণ হয় নি, সেই উৎসবের উপলক্ষে উপহার কিনে নিয়ে যাওয়া অবস্থির ব্যাপার। শিখক ঠিক করে রেখেছে বইটা অবস্থিদের বাড়ির দারোয়ানের হাতে দিয়ে আসবে। সমস্যা একটাই—দারোয়ান সবদিন থাকে না। গেট ধাকে ফাঁকা। তবে আজ যেহেতু বাড়িতে একটা উৎসব, দারোয়ানের থাকার কথা।

শিখক দোকানির দিকে তাকিয়ে বলল, মানিব্যাগ আনতে ভুলে গেছি। আপনার টাকাটা আগামীকাল ঠিক এই সময় দিয়ে দিব। চলবে?

দোকানি কোনো জবাব দিল না। সে গরম পানি দিয়ে কাপ ধূছে। তার চেহারার সঙ্গে একজন বিখ্যাত মানুষের চেহারার সুসাম্রাদ্ধ আছে। মানুষটা কে মনে পড়ছে না। দোকানির সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে হয়তো মনে পড়বে। শিখক অঙ্গুষ্ঠির সঙ্গে বলল, আমাকে আরেক কাপ চা খাওয়ান, আরেকটা ক্যাপস্টান সিগারেট। আগামীকাল ঠিক এই সময় আপনার সব টাকা দিয়ে দেব।

দোকানি কাপ দেয়া বক্ত রেখে শিখকের দিকে তাকিয়ে আছে। মনে হয় সে সিন্ধান্তহীনতায় ভুগছে। দোকানির



চোখের চাউলি দেখে শফিক নিশ্চিত
হলো, তার চেহারা আমেরিকান
প্রেসিডেন্ট অস্ত্রাহাম লিংকনের মতো।
অস্ত্রাহাম লিংকন লম্বা, আর এ বেঁটে।

দোকানি বলল, আমার হাত
ভিজা, আপনে বৈয়াম খুইলা ছিঁগেট
নেন।

বৃষ্টি পড়া শুরু হয়েছে। ফোটা
ফন হয়ে পড়ছে। অশ্চর্ষের কথা ব্যাঙ
তাকছে। শফিক দাঁড়িয়ে আছে
ধানমতি নয় নম্বৰ রোডের মাধ্যম।
আশপাশে ডোবা নেই যে ব্যাঙ
থাকবে। ধানমতি লেকের কোনো
ব্যাঙ কি রাস্তার নেমে আসেছে? বর্ষা
কই মাছ পাড়া বেড়াতে বের হয়,
ব্যাঙরা কি বের হয়?

শফিক ইছামতি বইটা
সিগারেটের বৈয়েমের উপর রেখে
চারের প্লাস হাতে নিয়েছে। দোকানি
বলল, আপনে ভিজতেছে কী জন্মে?
চালার নিচে খাড়ান। তদ্বামের
বৃষ্টি আসে আর যায়। এক্ষণ বৃষ্টি
থামব। আসমানে তারা ফুটব।

শফিক দেকানির পাশে বেছেছে।
সিগারেট পরিয়ে চায়ের কাপে চুম্বক
দিয়েছে। বৃষ্টি থামার কোনো লক্ষণ
দেখা যাচ্ছে না। চায়ের দোকানের
সামনে কালো রঙের একটা কুকুর
এসে দাঁড়িয়েছে। কুকুরটা থকাও।
দেশি কুকুর এত বড় হয় না।

দোকানি বলল, কুকুর শইলটা
দেখছেন? হালা ডোবা জেয়ান।

শফিক বলল, হঁ। বিবাট।

বড়লোকের কুকুর সাথে দেশি
কুকুর মিলছে বইলা এই জিনিসের
পরাদা হইছে।

দোকানি বৈয়াম খুলে একটা
টোক বিক্ষিট ছড়ে দিল। কুকুর বিক্ষিট
কামড়ে ধরে চলে গেল।

দোকানি বলল, প্রত্যেক দিন
সকার এই কুকুর আছে। এরে একটা
বিশুট দেই, মুখে নিয়া চইল্যা যায়।
ঠিক করছি কুকুরটারে ভালোমতো
একদিন খালা দিল। গোস-ভাত।

শফিক বলল, আপনার চেহারার
সঙ্গে অতি বিখ্যাত একজন মানুষের
চেহারার মিল আছে।

দোকানি বলল, গরিবের আবার
চেহারা কী?

আপনার নাম কী?
গরিবের নামও থাকে না। বাপ-
মা কানের বইল্যা ডাকে। ধরেন
আমার নাম কানের।

ছাতা মাধ্যম কে যেন এগিয়ে
আসেছে। অল্প বৃষ্টিতেই পানি জমে
গেছে। সোকটা পানিতে ছপ ছপ শৰ

করতে করতে আসেছে। শফিক আগ্রহ
নিয়ে তাকিয়ে আছে। দূর থেকে
মানুষটাকে চেনা চেনা লাগছে কিন্তু
পুরোপুরি চেনা যাচ্ছে না। আজকাল
শফিকের এই সমস্যা হচ্ছে, অথবা
দর্শনেই কাউকে সে চিনতে পারছে
না।

মাটোর সাব এইখানে কী করেন?

অবস্থার বাড়ির দারোয়ান
কালাম ছাতা মাধ্যম দোকানের সামনে
এসে দাঁড়িয়েছে। মনে হয় বিড়ি
বিলতে এসেছে। শফিক বিত্ত গলায়
বলল, বৃষ্টিতে আটকা পড়েছি।

কালাম বলল, ঘরে আসেন। ঘরে
আইসা বলেন।

শফিক বলল, ঘরে যাব না। তুমি
অবস্থার এই বইটা দিয়ো। তার
জন্মদিনের উপহার। বই দিতে এসে
বৃষ্টিতে আটকা পড়েছি। বইটা
সাবধানে নিয়ো, বৃষ্টিতে যেন ভিজে
না। তোমার আপার হাতেই দিয়ো।

কালাম গলা নামিয়ে বলল, বই
আকার হাতেই দিব। আপনি টেনশন
কইয়েন না।

কালাম বই হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে
আছে। যাচ্ছে না। সে দুই শলা
সিগারেট বিলতে এসেছে, মাটোর
সামনে বিলতে পারছে না। শফিক
উঠে দাঢ়াল। বৃষ্টি থামার জন্য
অপেক্ষা করা অর্থহীন, এই বৃষ্টি
থামবে না।

ভয়ঙ্গর কালো কুকুরটা আবার
উদয় হয়েছে। সে যাচ্ছে শফিকের
পেছনে পেছনে। শফিক কয়েকবার
বলল, 'এই যা বললাম, যা।' লাভ
হলো না। পানিতে ছপ ছপ শৰ তুলে
কুকুর পেছনে পেছনে আসেছেই। হঠাৎ
ছুটে এসে পা কামড়ে ধরবে না তো? শফিক
হাঁটার গতি বাঢ়াল। কুকুরও
তাই করল। তালো যন্ত্রণা তো!

অবস্থার দাদা সরফরাজ খানের হাতে
ইছামতি বই। দারোয়ান বইটা
সরাসরি তার হাতে দিয়েছে। তিনি
অগমে পাতা উঠিয়ে দেখেনেন,
লুকানো কোনো চিঠি আছে কি না।
চিঠি পাওয়া গেল না। বইটা তিনি
ছ্রাণে লুকিয়ে রাখেনেন। আগে নিজে
পড়ে দেখেনেন। বাইয়ের কোথায়
কোনো ইঙ্গিত কি আছে? হয়তো
দেখা যাবে এক প্রাইভেট মাটোরকে
নিয়ে কাহিনী। বড়লোকের মেয়ের
সঙ্গে তার অংগ হয়। বাড়ি থেকে
পালিয়ে সেই মেয়ে মাটোরকে বিয়ে
করে। তাদের সুখের সংসার হয়।
গল্প-উপন্যাস হলো অঞ্জবয়েসী

মেরেদের মাথা খারাপের মন্ত্র। তাঁর
মতে, দেশে এমন আইন থাকা
উচিত যেন বিয়ের আগে কোনো
মেয়ে 'আউট বই' পড়তে না পাবে।
বিয়ের পরে যত ইচ্ছা পড়ুক। তখন
মাথা খারাপ হলে সমস্যা নাই।

সরফরাজ খান ইজিয়োরে
আবশ্যিক হয়ে আছেন। নাতনির
জন্মদিনের নিমজ্জিত অতিথিরা এখনো
কেউ আসে নি। যেভাবে বৃষ্টি নামছে
কেউ আসবে কি না কে জানে।
রাতেরবেলা এমনিতেই কেউ বের
হতে চায় না। দেশের আইনশৃঙ্খলা
পরিষ্কৃতি শোচনীয়।

মুক্তিযুক্তের সময় যে অন্ত
মানুষের হাতে চলে পিয়েছিল তা সব
উক্তির হয় নি। নিল-দুপুরেই ভাকতি-
ছিলতাই হচ্ছে। যাদের হাতে
অইনশৃঙ্খলা রক্ষার কথা, তাদের
কেউ কেউ ভাকতি-ছিলতাই-এ
নেমেছে। সরফরাজ খানের মনে
হলো, তারতের সেলাবাহিনীকে এত
তাড়াতাড়ি বিদায় করা ভুল হয়েছে।
এরা থাকত আরও কিছুদিন।

সরফরাজ গলা উঠিয়ে এ বাড়ির
একমাত্র কাজের মেয়ে রহিমাকে
ভাকলেন। রহিম পানেরো বছু ধরে
এ বাড়িতে আছে। কর্তৃ নিয়ে
আছে। যতই দিন যাচ্ছে তার কর্তৃত
ততই বাড়ছে। এখন সে মুখে মুখে
কথা বলে।

রহিমা এসে দাঢ়াল, মাথার
যোগটা দিতে বলল, কী
বলবেন তাড়াতাড়ি বলেন। পাক
বসাইছি। বুড়া গুরু মাস আসছে,
সিঙ্গ হওনের নাম নাই।

সরফরাজ বললেন, এখন থেকে
মাটোর যতক্ষণ অবস্থিতে পড়াবে তুমি
সামনে বসে থাকবে।

এইটা কেমন কথা! আমার
কাইজকাম কে করব?

সরফরাজ কঠিন গলায় বললেন,
এ বাড়িতে আমি আর অবস্থি এই
দুজন মানুষ। এত কাজকর্ম কোথায়
দেখলে? শুধু বাড়ি কথা।

রহিমা বলল, দুইজন মানুষ
এইটা কী বললেন? আমরারে
মানুষের মধ্যে ধরেন না? আমি
আছি, ডেরাইভার তাই আছে,
দারোয়ান আছে। সবের পাক এক
চূলায় হয়। পাচজন মানুষ। আপনের
কথা শেষ হইছে? এখন যাব?

অবস্থি কোথায়?

আমা ছানে।

বৃষ্টির মধ্যে সে ছানে কী করে?
এইটা আমারে জিগান। আমি

ক্যামনে বলব! যে আসামি সে
জবাববকি দিবে, আমি আসামি না।
কথাবর্তী হিসাব রেখে বলবে।
এখন যাও, অবস্তিকে আমার কাছে
পাঠাও। আর যে কথা প্রথম বললাম,
অবস্তি যখন তার মাটোরের কাছে
পড়বে তুমি উপস্থিত থাকবে।
অতিলিম থাকতে হবে না। মাঝে
মাঝে আমি থাকব।

তাদের মধ্যে কোনো ঘটনা কি
ঘটেছে?

জানি না। ঘটতে পারে। সাবধান
থাকা ভালো। তুমি টেবিলের নিচে
তাদের পায়ের দিকে লক রাখবে।
পারে পায়ে ঢোকাতুকি দেখলেই
বুবাবে ঘটনা ঘটেছে। এরকম কিছু
চোখে পড়লে মাটোরকে কানে ধরে
বিদ্যায় করব। বদ কোথাকার!

অবস্তি ছাদে হাঁটছে, তবে বৃষ্টিতে
ভিজে না। তার গায়ে মৌলি রঙের
রেইনকোট। এই রেইনকোট তার মা
ইসাবেলা স্পেন থেকে গত বছর
পাঠিয়েছিলেন। জন্মদিনের উপহার।
এবছরের জন্মদিনের উপহার এখনো
এসে পৌছান নি। তবে জন্মদিন
উপলক্ষে সেখা চিঠি এসে পৌছেছে।
অবস্তি সেই চিঠি এখনো পড়ে নি।
রাতে সুন্মতে যাওয়ার সময় পড়বে।
ইসাবেলা তার মেরোকে বছরে দুটা
চিঠি পাঠান। একটা তার জন্মদিনে,
আরেকটা প্রিসমাসে।

অবস্তিদের ছাদ ঝোপাকড়ে
বোবাই এক জংলি জয়গা। তার
দাদি জৈবিত থাকা অবস্থায় ছাদে বড়
বড় টব তুলে নামল গাছপালা
লাগিয়েছিলেন। তিনি নিয়মিত ছাদে
আসতেন, গাছগুলির যত্ন নিতেন।
তার মহুর পর অবস্তি ছাদে আসে।
কিন্তু টবের গাছে পানি দেয় না।
গাছগুলি নিজের মতো বড় হয়েছে।
কিছু মারে গেছে। কিছু টবে আগাছা
জনোছে। একটা কামিনীগাছ হয়েছে
বিশেল। বর্ষায় ফুল ফোটে। সেই গুরু
তীক্র। আজ অবশ্যি কামিনী ফুলের
গুরু পাওয়া যাচ্ছে না। এমনকি হতে
পারে কিছু বিশেষ দিনে কামিনী ফুল
গুরু দেয় না!

ছাদের রেলিংহের একটা অশ্ব
ভাঙ। অবস্তি মাঝে মাঝেই
রেলিংহের ভাঙ অংশে দাঢ়ায়। সে
ঠিক করে রেখেছে, কোনো একদিন
সে এখান থেকে নিচে বাঁপ দেবে।
বাঁপ দিয়ে যেখানে পড়বে সে
জায়গাটা বাঁধানো। কাজেই তার
মৃত্যুর সংস্কারনা আছে। আজ সে বাঁপ

দেবে না বলেই কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে
থেকে নিচে নেমে এল। রাহিমা বলল,
আপনের দাদা ডাকে। মনে হয়
কেনো জটিল কথা বলবে।

অবস্তি তার দাদাজানের সামনে
দাঁড়িয়ে বলল, দাদাজান জটিল কিছু
বলবে?

সরফরাজ নাতনির দিকে তাকিয়ে
প্রবল দৃঢ়বোধে আপুত হলেন।
মেয়েটা পৃথিবীর সব রংপ নিয়ে চলে
এসেছে। অতি রূপবন্তীদের কপালে
দৃঢ় ছাড়া কিছু থাকে না। তিনি
দীর্ঘনিশ্চাস চাপতে চাপতে বললেন,
হঁ, বলব।

উপদেশমূলক কথা? জন্মদিনে
উপদেশমূলক কথা তানতে ভালো
লাগে না।

কী ধরনের কথা শুনতে ভালো
লাগে?

মজার কোনো কথা।

সরফরাজ বিরজ গলায় বললেন,
আমি তো মজার কোনো কথা জানি
না।

অবস্তি বলল, আমি জানি। আমি
বলি তুমি শোন—

আমার মা'র নাম স্পেনের রানী
ইসাবেলার নামে। রানী ইসাবেলা
সারা জীবনে দু'বার মাত্র জান
করেছেন।

সরফরাজ বললেন, এটা তো
মজার গল্প না। নোংরা ধাকার গল্প।

অবস্তি বলল, রানী ইসাবেলা
যখন দুরবারে যেতেন তখন পোশাক
পরতেন। বাকি সময় নপুঁ ঘোরাকেরা
করতেন। গায়ে কাপড় লাগলে গা
কুটকুট করত এই জন্মে।

সরফরাজ হতভম গলায় বললেন,
এই গল্প তোমাকে কে বলেছে?
মাটোর?

উনি এই গল্প বেন করবেন? মা
চিঠিতে লিখেছেন। মা চিঠিতে মজার
কথা লেখেন।

সরফরাজ কঠিন গলায় বললেন,
মে চিঠিতে এই গল্প আছে সেই চিঠি
আমাকে পড়তে দিবে।

কেন?

আমার ধরণী কোনো চিঠিতে
এমন কথা তোমার মা লিখে নাই।
এই নোংরা গল্প অন্য কেউ তোমার
সঙ্গে করেছে। বুবোছ?

অবস্তি হাসল।

সরফরাজ বললেন, হাসছ কেন?
তোমার এই গল্প আমি সিরিয়াসলি
নিয়েছি।

অবস্তি বলল, তুমি সবকিছুই

সিরিয়াসলি নাও। আমার বিষয়ে
তোমাকে এত ভাবতে হবে না।

তোমার বিষয়ে কে ভাববে?

অবস্তির জবাব দেওয়ার আগেই
দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হলো।
নিম্নস্তুতি অতিথিদের কেউ মনে হয়ে
এসেছেন।

প্রথম অতিথির নাম খালেদ
মোশাররফ। প্রিগেডিয়ার খালেদ
মোশাররফ। অবস্তির বাবুর বন্ধু।

অবস্তি মা! কেমন আছ?

ভালো আছি চাকু।

আজ তোমাকে অন্য দিনের চেয়ে
একটু কম সুন্দর লাগছে। এর কারণ
কী মা?

চাকু! আপনি যখনই আসেন এই
কথা বলেন।

খালেদ মোশাররফ বললেন,
আমি মিলিটারি মানুষ। যা দেখি তাই
বলি। আমি তো বাসিয়ে বাসিয়ে
বলতে পারি, অবস্তিকে আজ পরীর
মতো সুন্দর লাগছে।

মিলিটারিতা কি সরসময় সত্তি
কথা বলে?

না মে মা। যখন যুদ্ধক্ষেত্রে থাকে
তখন অবশ্যই বলে। যুদ্ধের সময়
মিথ্যা বলার সুযোগ থাকে না।

সরফরাজ তেতুল থেকে বললেন,
কে এসেছে? খালেদ!

অবস্তি বলল, হ্যা দাদাজান।
জন্মদিনের পার্টি এখন শুরু হলো।

শক্তির তার ঝিগাতলার বাসার
বারাক্কায় কেরোসিনের ছুলায় ভাত
বসিয়েছে। দুপুরের ডাল রয়ে গেছে।
রাতে ভালোর সঙ্গে তিম ভাজা করা
হবে। ডাল থেকে উক গুঁ আসছে।
গরমে নষ্ট হয়ে যাওয়ারই কথা।
শক্তির ঠিক করল এখন থেকে বাড়তি
কিছু বান্না হবে না। যতটুকু ধর্যাজন
ততটুকুই রাখবে।

বাজারে চাল পাওয়া যাচ্ছে না।
বাংলাদেশের মানুষ একবেলা কৃতি
যাচ্ছে। শক্তির কৃতি থেকে পারে না।
কৃতি বানানোও কামেলা। আটা দিয়ে
কাই বানাও, বেলুন দিয়ে কৃতি বেলো,
তাওয়ার দেবো। ফেলা দিগদারি।

সবচেয়ে ভালো হব রাধানাথ
বাবুর মতো একবেলা ধাওয়ার অভ্যাস
করলে। তিনি সূর্য়দেবীর পরগু
একবেলা বাল। তাতে বালি তাঁর
সমস্যা না হব শক্তিকের কেন হবে!
রাধানাথ বাবু এখন একটা বই
নিখেছে—বাবীনুনাথ এবং মৌক ধর্ম।
তাঁর মানান রকম অঙ্গুত অঙ্গুত তথ্য



দরকার হয়। শফিকের উপর দায়িত্ব পড়ে তথ্য অনুসন্ধানের উপর। শফিককে তিনি মাগলা খাটোন না। প্রতিটি তথ্যের জন্যে কুড়ি টাকা করে দেন। রাধানাথ বাবুর কাছে শফিকের চার্লিং টাকা পাওনা হয়েছে। রাধানাথ বাবু বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ কোনো এক জনাগাম জীবন এবং মৃত্যুকে রমণীর দুই তন হিসেবে ভেবেছেন। আমার কিছুই মনে পড়ছে না। তুমি খুঁজে বের করতে পারলে চার্লিং টাকা দেব। রবীন্দ্র রচনাবলী প্রথম পঠা থেকে পড়া ওর করো।

শফিক আজই খুঁজে পেয়েছে। কাল সকালে যাবে, টাকাটা নিয়ে আসবে। তার হাত একেবারেই থালি।

কবিতার লাইন দুটি আছে নেবেদ্য কাব্যস্থে। কবিতার নাম 'মৃহু'।

মৃহু হতে তুলে নিলে কাঁদে শিশি ডরে,
মৃহুর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে তনাস্তরে।

ভাত হয়ে গেছে। তিম ভাজা গেল না। একটাই তিম ছিল, সেটা পচা বের হয়েছে। শফিক টকে যাওয়া ডাল দিয়ে থেতে বসল। কয়েক নলার বেশি যাওয়া গেল না। শরীর উচ্চে আসছে। আজকের ডালমাখা ভাত অবশ্য নষ্ট হবে না। বিশাল কুকুরটা তার পেছনে পেছনে এসে যেতে থাবা গেড়ে বসে আছে। সে নিচৰ সুধার্ত। এত বড় শরীরের জন্যে অচুর যাদা দেবকার।

শফিক ডাল মাখানো ভাত উঠানে ঢেলে দিল। কী আগ্রহ করেই না কুকুরটা থাচ্ছে! ঘরে একটা টিনের পালা থাকলে থালায় ভাত দেওয়া যেত। পৎপর্যবেক্ষণ তো বিছুটা সম্মান আশা করতে পারে। শফিক বলল,

এই তোর নাম কী?

কুকুরটা মাথা তুলে তাকিয়ে আবার খাওয়ার ফল দিল। শফিক বলল, আমি তোর নাম দিলাম কালাপাহাড়। নাম পঢ়ব হয়েছে?

কুকুর এইবার ঘেউ শব্দ করল।

শফিক বলল, খাওয়াদাওয়া করে চলে যা। আমি খুবই গরিব মানুষ। ডালটা নষ্ট না হলে আমিই খেতাম। তোকে দিতাম না। আমার পজিশন তোর চেয়ে খুব যে উপরে তা কিন্তু না।

কালাপাহাড় আবেকবার ঘেউ করে তরে পড়ল। তার ডিনার শেষ হয়েছে। অড্ডবুটির বাতে সে আর বের হবে না। এখানেই থাকবে।

অবস্থি মাঝের চিঠি নিয়ে গুরোৱে।

যাম খুলেই সে অথবে গুরু ডেকল। তার মা চিঠিতে দু'কোটা পারফিউম দিয়ে যাম বক করেন। গাঁথের খানিকটা থেকে যায়।

আজকের গঢ়টা অস্তু। চা-পাতা চা-পাতা গুরু। মা'র কাছ থেকে এই পারফিউমের নাম জানতে হবে।

অবস্থি পঢ়তে শুরু করল—

শুভ জন্মদিন অবস্থি মা,

তুমি তোমার মে ছবি পাঠিয়েছে, এই মৃহুর্তে তা আমার লেখার টেবিলে। আমি অবল সুর্য নিয়ে ছবিটির দিকে তাকাতে তাকাতে তোমাকে লিখছি। তুমি আমার চেয়ে অনেক বেশি সুবর হয়ে পৃথিবীতে এসেছে। তোমার মতো বয়সে সবাই আমাকে ডাকত 'Flower', তোমার নাম আমি দিলাম 'বর্ণের পুল্প'। একটাই গুলি—তোমার চোখ আমার চোখের মতো নীল হয় নি। তুমি তোমার বাবার

কালো চোখ পেয়েছে। ভালো কথা, তোমার বাবার সঙ্গে কিংবদন্তির কোম্পো যোগাযোগ হয়েছে? আশ্চর্যের ব্যাপার, মানুষটা বিশেষ পর্যন্ত হারিয়েই গেল?

তুমি চিঠিতে তোমার এক গৃহশিল্পকের কথা লিখেছে। তুমি কি এই মূরকের খেমে পঢ়েছ? চট করে করও খেমে পঢ়ে যাওয়া কোনো কাজের কথা না। অতি ঝপঝতীদের কারও খেমে পঢ়তে নেই। অন্যরা তাদের খেমে পঢ়াবে, তা-ই নিয়ম।

এখন আমি তোমার ভবিষ্যৎ পরিবহন জন্মতে চাই। তুমি কি আসবে আমার এখানে?

যুদ্ধবিহুস্ত একটি হতদরিদ্র দেশে পঢ়ে থাকার কোনো মানে হ্যাঁ না। তোমার বৃক্ষ দাদাজীলকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য দেশে পঢ়ে থাকতে হবে—এটা কোনো কাজের কথা না। তোমার জীবন তোমার একারাই। এক বৃক্ষের সেখানে জড়ানোর কিছু নেই।

লুইসের সঙ্গে আমার ছাড়াজাড়ি হয়ে গেছে। এখন আমি একা বাস করছি। লুইসের কারণে আমি অনেক টাকার মালিক হয়েছি। চিক করেছি সম্মুদ্রের কাছে একটা ভিলা কিমে বাস করব। তুমি আমার সঙ্গে এসে থাকতে পারো। মা-মেরে সুখে জীবন পার করে দেব।

তোমার জন্মদিন উপলক্ষে পারফিউমের একটা সেট পঠালাম। তোমার যেৱল বছৰ হয়েছে বলে ঘোলটা

পারফিউম। এর মধ্যে তোমার কাছে সবচেয়ে ভালোটার নাম আমাকে লিখে পাঠাবে। যদি আমার পছন্দের সঙ্গে মিলে যাব তাহলে পুরকার আছে।

মা তুমি ভালো থেকো।

ইসাবেলা

মেঘ কেটে আকাশে ঢাঁচ উঠেছে। ভাদ্রমাসে ঢাঁদের আলো সবচেয়ে ধৰল হয়। চৰদিকে পানি জমে থাকে বলে ঢাঁদের আলো প্রতিফলিত হয়ে ভাদ্রের চৰ্ম-বাত আলোমর হয়।

শফিক বারান্দায় কাঠের বেঞ্চে বসে আছে। বৃষ্টিভজা উঠান ঢাঁদের আলোয় চিকচিক করছে। এই রূপ শফিককে শৰ্প করছে এবং মানে হচ্ছে না। সে কুধার অঙ্গুষ্ঠি। কুধার সময় দেবতা সামনে এসে দাঁড়ালে তাকেও নাকি বাদাম্বৰ্যা মনে হয়।

কালো কুকুরটা এখনো আছে। শফিক বেঞ্চে বসামাত্র সে উঠে এসে বেঞ্চের নিচে ঢুকে পড়ল। এক ধালা টকে যাওয়া ডালমাখা ভাত খেয়ে সে কৃতজ্ঞতায় অঙ্গুষ্ঠির হয়ে আছে।

শফিক ভাকল, কালাপাহাড়! এই কালাপাহাড়!

কালাপাহাড় সাড়া দিল। বেঞ্চের নিচ থেকে মাথা বের করে তাকাল শফিকের দিকে। শফিক বলল, কুকুর হয়ে জন্মানোর একটা সুবিধা আছে। খুব কুধার্ত হলে ডাটাবিন ঘাঁটাঘাঁটি করলে কিছু-না-কিছু পাওয়া যাব। মানুষের এই সুবিধা নেই।

কালাপাহাড় বিচিত্র শব্দ করল।

শফিকের বেন জানি মনে হলো কুকুরটা তার কথা বুঝতে পেরে জবাব দিয়েছে। শফিকের হঠাৎ করেই গায়ে কাটা দিল।

ରାଧାନାଥ ବାବୁର ବସ ପର୍ଯ୍ୟଟି । ତାର ମାଧ୍ୟାର୍ତ୍ତ ସବଧରେ ସାଦା ଚାନ୍ଦେ ଦିକେ ତାକାଲେଇ ତୁମ୍ଭ ବସ ଯୋକା ଯାଏ । ସବଳ ସୁଠାମ ବେଟେଖାଟୋ ମନ୍ଦୁସ । ଚୋଖ ବଡ଼ ବଡ଼ ବଲେ ମନେ ହୟ ତିଲି ମାରାକଣ ବିଶିଷ୍ଟ ହୟେ ଆଛେନ । ତାର ଗାତ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ଅବଭାବିକ ଶୌର । ତାର ମାଦି ବଲତେମ, ଆମାର ରାଧୁର ଗା ଥେକେ ଆଲୋ ବେର ହୟ । ରାତରେବେଳେ ଏହି ଆଲୋତେ ତୁଳସି ଦାସେର ରାମାୟଣ ପଡ଼ା ଯାଏ ।

ଚିରକୁମାର ଏହି ମାନୁଷଟି ନୀଳକ୍ଷେତ୍ରେ ଏକଟା ଦୋତଳା ବାଡ଼ିର ଚିଲେକୋଠାର ଥାକେନ । ଏକତଳାଯ ତାର ପ୍ରେସ । ପ୍ରେସେର ନାମ 'ଆଦର୍ଶଲିପି' । ପ୍ରେସେର ସଙ୍ଗେ ଜିଂକ ରକେର ଏକଟା ଛୋଟ କାରଖାନା ଓ ଆଛେ । ପ୍ରେସେର ଲୋକଜଳ ତାକେ ତାକେନ ସାଧୁବାବା । ସାଧୁବାବା ଡାକାର ମୌକ୍ତିକ କାରଣ ଆଛେ । ତାର ଆଚାର-ଆଚାରଣ, ଜୀବନଯାପନ ପର୍ଦତି ସାଧୁସନ୍ତଦେର ମତୋ ।

ବାଡ଼ିର ଚିଲେକୋଠାର ତାର ଧାର୍ମନାଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ପଶମେ ଆମନେ ବସେ ଚୋଖ ବକ୍ଷ କରେ ତିଲି ଅତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଧାର୍ମନାଯ ବଳେନ । ତାର ନାମନେ ଥାକେ ଭୁଧାକଲିର ଏକଟା ବାଁଧାନୋ ପାରେର ଛପ । ଏହି ଛପଟା କରି ପାରେନ ତା ତିଲି କାଟୁକେ ଏଥିନେ ବଳେନ ନି । ଧାର୍ମନାର ସମୟ ପାରେର ଛପେର ସାମନେ ରେଡ଼ିର ତେଲେର ଧୀପ ଜୁଲେ । ଧୂପ ପୋଡ଼ାନୋ ହୟ । କୋମୋ କୋମୋ ଦିନ ଧାର୍ମନା ଦ୍ରତ୍ତ ଶେଷ ହୟ, ଆବାର ନୀର୍ଦ୍ଦମ୍ଭ ନିଯୋଗ ଓ ଧାର୍ଥା ଚଲେ ।

ସାଧୁବାବା ରାଧାନାଥ ଓଟିବ୍ୟାଘନ୍ତ ନା, କିନ୍ତୁ ତିଲି ମଧୁମେର ଶ୍ରୀ ବାଁଚିଯେ ଚଲେନ । ତାର ପରିଚିତ ସବାଇ ବିଷୟଟି ଜାନେ ବଳେ ଖୁବ ସାବଧାନେ ଥାକେ । ଦୈବାଂ କାରାଓ ଗାରେର ସଙ୍ଗେ ଗା ଲେଗେ ଶେଇ ତିଲି ତଥକଣ୍ଣାଂ ଜ୍ଞାନ କରେନ । ଜ୍ଞାନେର ପର ଭେଜା କାପଡ ବଦଳାନ ନା । ଭେଜା କାପଡ ଗାଯେ ତୁକନ ।

ତିଲି ନିରାମିବାଣି ଏବଂ ଏକହାରି । ଶୂର୍ଯ୍ୟ ଦୋବାର ଆଗେ ଆଗେ ଖାବାର ଖନ, ତବେ ସାରା ଦିନଇ ଘନଘନ ଚା ଖନ, ଜେବୁର ଶରବତ ଖନ ।

ରାଧାନାଥ ବାବୁର ସାମନେ ଦୈନିକ ଇନ୍ଦ୍ରଜଳକ ହାତେ ଶଫିକ ବସେ ଆଛେ । ମେ ଏହି ବାଡ଼ିତେ ପ୍ରତିଦିନ ସକଳ ନ ଟାର ମଧ୍ୟେ ଏଥେ ପଡ଼େ । ତାର ଦୁଇ ଦାରିହରେ ଏକଟା ରାଧାନାଥ ବାବୁକେ ଖବରେର କାଗଜ ପଡ଼େ ଶେନାନୀ ଏବଂ ତାର ଡିକଟରେଶନ ନେ ଓରା । କିନ୍ତୁଦିନ ହଲୋ ରାଧାନାଥ ବାବୁର ଜୋଖେର ସମୟ ହଜେ । ପଡ଼ତେ ଗେଲେ ବା ଲିଖିତେ ଗେଲେ ଚୋଖ କଢ଼କଢ କରେ । ଚୋଖ ଦିନୋ ପାନି ପଡ଼େ । ତିଲି ଭାଙ୍ଗରେର କାହେ ପିମୋଛିଲେନ । ଭାଙ୍ଗର ବଳେହେ ଚୋଖେର ପାତାମ ଶୁଶ୍ରକି ହରୋହେ । ବିରକାଳ ତିଲି ଜେନେହେ ଖୁଶକି ମାଥାର ହୟ । ଖୁଶକି ମେ ଚୋଖେର ପାତାର ଓ ହୟ ତା ତାର ଜାନା ଛିଲ ନା । ଜଗତେର କତ କିନ୍ତୁଇ ସେ ତିଲି ଜାନେନ ନା ତା ତେବେ ସେଦିନ ତିଲି ବିଶିଷ୍ଟ ହରୋଛିଲେନ ।

ଶଫିକ ବଲଲ, ଆଗେ କି ହେଡଲାଇନଗୁଲି ପଡ଼ିବ ?

ରାଧାନାଥ ବଲଲେନ, ଏକଟା ଜାତୀୟ ଦୈନିକେ ଭାଲୋ କୋନୋ ଖବର ଛପା ହବେ ନା ତା ହୟ ନା । ଭାଲାମତୋ ଝୁଜେ ଦେଖୋ, ମିଶ୍ରମାନ୍ଦିକିନ୍ତୁ-ନା-କିନ୍ତୁ ଆଛେ । ରିକାଶା-ଭ୍ୟାଲାର ସତତା, ମାନିବ୍ୟାଗ କୁଣ୍ଡିଯେ ପେଯେ କେବତ ଦିଯୋହେ ଟାଇପ କିନ୍ତୁ ଥାକାର କଥା ।

ଶଫିକ ବଲଲ, ଏକଟା ପେଯୋଛି । ଲବନେର ଦାନ କିନ୍ତୁ କମେହେ । ଆଗେ ଜିଲ ଘାଟ ଟାକା କେଜି, ଏଥିଲ ହରୋହେ ପଞ୍ଚାଶ ଟାକା କେଜି । ସରକାର ହୁଲଗଥେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟା ଥେକେ ଲବନ ଆମଦାନିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଯୋଛେ ।

ରାଧାନାଥ ବିରକ୍ତ ଗଲାଯ ବଲଲେନ, ତୁମ ତୋ ଖୁବଇ ଖାରାପ ଏକଟା ଖବର ପଡ଼ିଲେ । କଞ୍ଚକାଜାର ଭତ୍ତି ସାମ୍ବାନ୍ଦିକ ଲବନ । ଅର୍ଥାତ ଲବନ ଆନନ୍ଦେ ହଜେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟା ଥେକେ । ହୋଇଟ ଏ ଶେମ ! ଏଥିନ ଭାଲୋ ଖବରଟା ପଡ଼େ ।



শক্তিক বলল, দুটা একশ টাকার নোটের ছবি পাখিগাণি ছাপা হয়েছে। নোট দুটার মন্তব্য এক। খবরে বলেছে, বাংলাদেশের কারেলি ইতিমা ছেপে দেয়। ধারণা করা হচ্ছে তারা দুই সেট কারেলি ছাপে। এক সেট বাংলাদেশকে দেয়, অন্য সেট তারা বাংলাদেশী পণ্য নেওয়ার জন্য বাবহার করে।

রাধানাথ বললেন, এটা তো খুবই ভালো খবর।

ভালো খবর?

অবশ্যই ভালো খবর। বাংলাদেশ সরকার গা বাড়ি দিয়ে উঠবে। ইতিমা প্রতি নির্ভরতা করবে।

শক্তিক বলল, আপনার যুক্তি অস্তুত, কিন্তু ভালো।

রাধানাথ বললেন, যুক্তিবিদ্যা অতি দুর্বল বিদ্যা, সবদিকে এই বিদ্যা খাটোনো যায়। যাই হোক, তুমি চলে যাও আজ আমি ডিকটেশন দেব না।

আপনার বি শরীর খারাপ?

হঁ। চোখের যত্নে বাড়ছে। মনে হয় অক্ষ হওয়ার পথে এগছি। এটা ভালো।

কীভাবে ভালো?

জগতের রূপ দেখতে হয় চোখ বক করে। হাসন রাজা তাই বলেছেন, “আর্থি মুঁজিয়া দেখো রূপ রে।” জগতের রূপ দেখার জন্য তৈরি হচ্ছি, খারাপ কী? ছ্রায়াটা খেল।

শক্তিক ছ্রায়ার খুলু।

রাধানাথ ঝালত গলার বলল, তোমার চত্বিশ টাকা পাওনা হয়েছে। পঞ্চাশ টাকার নোটটা নিয়ে যাও। দশ টাকা পরে ফেরত দিয়ো। তিসিবির একটা রসিদ আছে দেখো। রসিদে হয় শার্টের জন্য আড়াই গজ কাপড় দিবে নয়তো প্যান্টিস দেবে। রসিদ দেখিয়ে তোমার যেটা অয়েজন নিয়ে নিয়ো। এখন বলো, মানুষের সবচেয়ে কঠিন অভাব কোনটা?

খাদ্যের অভাব।

হয় নাই। বন্দের অভাব। ফুর্ধার্ত অবস্থায় তুমি বের হতে পারবে। তিক্কা চাইতে পারবে। নগু অবস্থায় সেটা পারবে না। তোমাকে দরজা-জনলা বক করে দরে বসে থাকতে হবে।

শক্তিক বলল, আপনার চোখ দিয়ে পানি

পড়ছে।

রাধানাথ বললেন, দেখে কি মনে হচ্ছে না গভীর দৃঃখ্যে আমি কাদছি?

মনে হচ্ছে।

রাধানাথ আঝাহের সঙ্গে বললেন, ধর্মগুশার একজন সাধুর নাম অশ্ববাবা। তিনি ভক্তদের দেখাই চোখের পানি ফেলতেন। অশ্ববাবার নামতাক তনে একবার তাঁকে দেখতে গোলাম। তিনি দু'হাতে আমার ডানহাত জড়িয়ে বললেন। তাঁর চোখ দিয়ে টপটগ করে জল পড়তে লাগল। আমি আবিকার করলাম, তাঁর চোখের কোনো সমস্যার কারণে তিনি অশ্ববৰ্ষণ করেন। ভক্তের দৃঃখ্যে আপুন হয়ে বা তার এতি মনতাবশত অশ্ববৰ্ষণ করেন না। তাঁর হাতটা আমার দেখার শর্খ ছিল। আমি বললাম, বাবা, আপনার হাতটা একটু দেখি। আমি একজন শখের হস্তেরখবিদ। তিনি সঙ্গে সঙ্গে দুই হাত মুঠা করে চোখমুখ শূক করে ফেললেন। অশ্ববাবা এরকম কেন করলেন জানো?

না।

তিনি নিশ্চয়ই বড় কোনো পাপ করেছেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল আমি হাত দেখে সেটা ধরে ফেলব।

শক্তিক বলল, আপনি আমার হাতটা একদিন দেখে দেবেন না?

রাধানাথ বললেন, না। হাতের রেখায় মানুষের ভাগ্য থাকে না। মানুষের ভাগ্য থাকে কর্মে। তোমার কর্ম তো আমি দেবছি।

শক্তিক বলল, হাতের রেখা বিশ্বাস করেন না তাহলে হাত দেখেন কেন?

রাধানাথ বললেন, পাঁচ হাজার বছর ধরে মানুষ তুলের পেছনে কেন ছুটছে কেন এই বিদ্যার চর্চা এখনো হচ্ছে তা জনার জন্যে। এখন তুমি বিদ্যায় হও। আজ একদিনে অনেক কথা বলে ফেলেছি। আজকের কথা বলার কোটা শেষ। আজ আর কথা বলব না। চোখ বক করে ওয়ে থাকব।

‘অতিভুক্তিরতী বেক্তিঃ

সদ্ব্যোগাপহারণী’

এর অর্থ—অতিরিক্ত ভোজ এবং অতিরিক্ত বাচালতা সদ্ব্যোগ প্রাপনাশক।

রাধানাথ বাবু দরজা-জনলা বক করে ইঞ্জিয়োরে শুয়ে পড়লেন। তিনি চিলেকোঠায় মেঝেতে পাতা শীতলপাতিতে মুমাল। এই ঘরে কখনো না। এটা অতিথি-অভাগতদের অভার্ধনার ঘর। দেয়ালে যামিনী রাধের মুর্দা ছবি আছে। দুই ছবির মাঝখানে রামকিংবৰ বেইজের ছয়িং। ছবিগুলি যতে আছে তা না। যামিনী রাধের হক খুলে গেছে বলে তিনি ক্ষীস নেওয়ার মতো দেয়ালে ঝুলছে।

রাধানাথ সন্ধ্যা পর্যন্ত মুমালেন। ঘুমের মধ্যে সপ্নে দেখেলেন, তাঁকে একটা প্রকাও কাঠালগাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। গাছভর্তি বিষ পিপড়া। অর্ধেকটা লাল অর্ধেকটা কালো। বিষ পিপড়ারা তাঁকে কামড়াচ্ছে। হাত-পা বাঁধা বলে তিনি গা থেকে পিপড়া তাড়াতে পরাছেন না। আশপাশে কেউ নেই সে তিনি সাহায্যের জন্যে ডাকবেন।

এই সপ্নেটা তিনি এর আগেও কয়েকবার দেখেছেন। প্রতিবার সপ্নেই কিছু পার্ক থাকে কিন্তু মূল বিষয় এক। তিনি গাছের সঙ্গে বাঁধা। পিপড়া তাঁকে কামড়াচ্ছে। এই সপ্নের কোনো ব্যাখ্যা কি আছে? কেউ তাঁকে কোনো বিষয়ে সাবধান করে দিতে চাহে? সেই কেউটা কে? বিশ্বব্যাকে আদি পিতা? সেই আদি পিতাকে কে সৃষ্টি করেছে? তিনি স্বারূপ নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেছেন। সেটা কী করে সম্ভব!

রাধানাথ ভুক্তচকে বসে আছেন। আজ আর চিলেকোঠার ধার্থায়ে যাওয়া হবে না। সুর্যের অতিক্রম বিষয়ে সন্দেহজনক কোনো চিন্তা মাথায় এলে তিনি অস্ত্রির বোধ করেন। সেদিন আর তাঁর ধার্থায়ের মাওয়া হবে না। এক-দু'দিন সময় লাগে মন ঠিক করতে। মন ঠিক হওয়ার পর জীবনযাপন সাভাবিক হয়ে আসে।

দরজা খুলে পেসের পিওন মাথা বের করল। তাঁর চোখে ভয়। সাধুবাবার সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন পড়লে সে কোনো কারণ ছাড়াই ভয়ে অস্থির হয়ে পড়ে।

কিছু বলবি কষি?

বাবু চা দিব?

না।

আপনার কি শরীর খারাপ?

না।



আপনার কাছে একজন ভদ্রলোক আসছে। এক ঘন্টার উপরে হইল বইসা আছেন। আপনার সঙ্গে নাকি বিশেষ ওয়োজন। আমি কী বলব আপনি ঘুমে আছেন?

আমি তো ঘুমাইছি না। মিথ্যা বলবি কেন? ঘরে বাতি জ্বলা। ভদ্রলোককে এখানে নিয়ে আয়।

বাবু, আপনাকে কি লেনুর শরবত বানায়ে দিব?

আজ্ঞা দে।

ভদ্রলোকের পরনে পারাজামা-পাঞ্জাবি। পায়ে চপ্পল। অত্যন্ত সুস্কৃত। এই সন্ধ্যাবেলাতেও তার চোখে কালো চশমা। রাধানাথের বিজ্ঞানার কাছে রাখা কাটোর চেয়ারে তিনি মোটামুটি শক্ত হয়ে বসে আছেন। চেয়ারের হাতলে হাত রাখা, সেই হাতও শক্ত। রাধানাথ বললেন, আমার কাছে কী ওয়োজন?

ভদ্রলোক ইতস্তত করে বললেন, শুনেছি আপনি খুব ভালো হাত দেখেন। আমি আপনাকে হাত দেখাতে এসেছি।

রাধানাথ বললেন, আমি নিজের শখে মাঝে মধ্যে হাত দেখি। অন্যের শখে দেখি না।

ভদ্রলোক ছেট নিষ্ঠাস ফেললেন। রাধানাথ বললেন, হাত দেখার এই অপবিজ্ঞানে আমার কোনো আজ্ঞা নেই। দুবল মানুষ এর পেছনে ছোটে। আপনি দুবল হবেন কেন?

ভদ্রলোক বললেন, আমি আপনার জন্য সামান্য কিছু উপহার এনেছি। দার্জিলিংয়ের চায়ের দুটা প্যাকেট। আপনি উপহার গ্রহণ করলে আমি খুশি হব।

রাধানাথ বললেন, আমি উপহার গ্রহণ করলাম, কিন্তু আপনার হাত দেখব না। প্রেসে ফনি বলে এক কর্মচারী আছে, তার কাছে চায়ের প্যাকেট দিয়ে যান।

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। বিনীত গলায় বললেন, স্যার, তাহলে যাই। আপনাকে বিরক্ত করার জন্য লজ্জিত।

রাধানাথ কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, বসুন। দুই হাত মেলুন। তার আগে আমার টেবিলের ছায়ারে একটা ম্যাগনিফিইং গ্লাস আছে সেটা আমাকে দিন।

স্যার আপনাকে ধন্যবাদ।

ছাদ থেকে ঝুলন্ত চলিশ ওয়াট বাজ্রের আলো রাধানাথের জন্যে যাধেট না। রাধানাথ ম্যাগনিফিইং গ্লাস হাতে ঝুঁকে আছেন। তার চোখও সমস্যা করছে। কমালে বারবার চোখ মুছতে হচ্ছে।

আপনার নাম কী?

ভদ্রলোক নড়েচড়ে বললেন। জবাৰ দিলেন না। রাধানাথ বললেন, নাম বলতে কি সমস্যা আছে? সমস্যা থাকলে বলতে হবে না। নামে কিছু আসে যায় না। আসে যাব কৰ্মে। বিশ্বাসিতেকে বিশ্বাসিত ডাকলেও তার মিষ্টত্ব কিছুমাত্র কমাবে না।

আমার নাম করিদ।

রাধানাথ ছেট নিষ্ঠাস ফেলে বললেন, আসল নাম গোপন কৰলেন তাই না? করিদ নামেও চলবে। আপনি সেনাবাহিনীতে আছেন? আপনার হাতভাব, চোখের কালো চশমায় এরকম মনে হচ্ছে। হাতে কিছু দেখা নেই।

আমি সেনাবাহিনীতে ছিলাম, এখন নেই।

মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন?

হঁ।

খেতাবধারী?

হঁ।

কতক্ষণ আর হঁ হঁ করবেন? দু'একটা কথা বলুন শুন। কী খেতাব পেয়েছেন? হাত দেখে মনে হচ্ছে বড় খেতাব। বীরউত্তম নাকি?

হঁ।

আপনার অপমাতে মৃত্যুর সংজ্ঞানা হবল। কাসিতে মৃত্যু। বিশেষ আর কিছু জানতে চাইলে কৃষ্টি তৈরি করতে হবে। তা খাবেন?

না।

আপনি সাহসী, একরোখা, জেনি এবং নির্বোধ। আপনার সুবিধা হচ্ছে, নিজের নির্বিকৃতার বিষয়ে আপনি জানেন অন্যরা জানে না। মনি সংজ্ঞ হয় একটা রত্ন ধীরণ করবেন। বর্তুর নাম গোমেদ, ইংরেজিতে বলে গান্দেট। দশ রত্নের মতো হলৈই চলবে।

আপনার এখানে পাওয়া যাব?

না। আমি রত্ন ব্যবসা করি না।

বড় কোথায় পাওয়া যাবে?

চাকায় পাবেন না, কলকাতা থেকে সংগ্রহ করলে ভালো হয়।

রাধানাথের চোখের ঘৃত্যা হঠাৎ অনেকখানি বাড়ল। তিনি কমালে চোখ ঢাকতে ঢাকতে বললেন, আপনি কি বিশেষ কিছু জানতে চান?

যুবক ইতস্তত করে বললেন, মানুষের ভাগ কি পূর্ণিমারিত?

রাধানাথ বললেন, এই জটিল ধন্যের উত্তর আমার জানা নেই। আপনাদের ধর্মগ্রন্থ অনুসারে পূর্ণিমারিত। সূর্য বলি ইন্দুরাইলে আল্লাহ বললো, আমি তোমাদের ভাগ্য তোমাদের গলায় নেকলেসের

মতো ঝুলাইয়া দিয়াছি। ইহা আমার পক্ষে সম্ভব।

আপনি কোরান শরিফ পড়েছেন?

অনুবাদ পড়েছি।

আগতুক বলল, আপনার দেয়ালে অতি

মূল্যবান কিছু ছবি দেখতে পাচ্ছি।

রাধানাথ বললেন, এই পৃথিবীতে মূল্যবান শুধু মানুষের জীবন, আর সবই মূল্যহীন।

আগতুক দার্শনিক কথাবার্তার দিকে না গিয়ে বলল, জীবগুলি অবশ্যে আছে। ধূলা মাকড়শা বুল। আমি কি আপনার প্রেসের ছেলে ফণিকে বলে ঠিক করে দিয়ে যাব?

না।

আপনার কাছে নাম গোপন করেছিলাম বলে দুঃখিত। আমার নাম শরিফুল হব। আজ্ঞা জনাব মাই।

রাধানাথ কোনো কারণ ছাড়াই খানিকটা অস্থির বেগ করলেন। যুবক কি তার নিজের অস্থিরতা খানিকটা তাঁকে দিয়েছে? এই সম্ভাবনা আছে। মানুষ চুক্কের মতো। একটি চুক্ক মেলন পাশের চুক্ককে প্রভাবিত করে, মানুষও করে।

শরিফুল হকের ডাকনাম ডালিম। মেজর ডালিম। এই নামের সঙ্গে আমরা পরিচিত।

১৫ আগস্ট, ১৯৭৫। ত্রুট্যাব। ভোরবেলা রেডিও বালাদেশ থেকে ডালিমের কঠ শেনা গিয়েছিল। এই যুবক আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করেছিল, “আমি মেজর ডালিম বলছি। সৈয়দাচারী মুজিব সরকারকে এক সেনাঅভ্যাসানের মাধ্যমে উৎখাত করা হয়েছে। সারাদেশে মার্শাল ল’ জারি করা হলো।”

এই অস্ত্র আপাতত থাক। যথাসময়ে বলা হবে। দুঃখদিসের গাথা একসঙ্গে বলতে নেই। দীরে দীরে বলতে হয়।

রাত আটটা।

শফিক অবস্তির পড়ার ঘরে বসে আছে। তাকে তা দেওয়া হয়েছে, সে চারের কাগে চুমুক দিয়ে। অবস্তি এখনো আসে নি। তার নামা সরফরাজ খান একটা বই হাতে বেতের চেয়ারে বসে আছেন। শফিক কথখো তাঁকে অবস্তির পড়ার ঘরে দেখে নি।

সরফরাজ বললেন, মাটোর, তোমার ছাত্রীর পড়াশোনা কেমন চলছে?

শফিক বলল, ভালো।

সরফরাজ বললেন, গৃহশিক্ষক বিষয়টাই আমার অপছন্দ। আইন করে গৃহশিক্ষকতা উঠিয়ে দেওয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। কেন জানো?

জিনা।

ছাত্রীরা গৃহশিক্ষকের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। নিজেরা কিছু বুক্ত করে চায় না। কঠ করতে চায় না। আমার কথায় যুক্তি আছে না?

জি আছে।

সরফরাজ বললেন, সৈতিকতাৰ বিষয়ও আছে। ছাত্রীৰা প্ৰেম শ্ৰেষ্ঠ গৃহশিক্ষকেৰ কাছে। তোমাকে কিছু বলছি না। তুমি আবাৰ কিছু মনে কৰো না। আমি ইন জেনারেল বলছি। গৃহশিক্ষক এবং ছাত্রীৰ প্ৰেম কোথায় ওঁক হয় জানো?

শফিক অবস্থির সঙ্গে বলল, না ।

শুরু হয় টেবিলের তলায় পায়ে পায়ে টুকরাটুকি থেকে । তারপর বই জেনদেন । বইয়ের পাতার ভেতরে চিঠি ।

সরকরাজ হয়তো আরও কিছু বলতেন তার আগেই অবস্থি চুকল । সে অবাক হয়ে বলল, দাদাজান, ভূমি এখানে কেন ?

সরকরাজ বললেন, আমি এখানে থাকতে পারব না ?

না । তুমি থাকবে তোমার ঘরে ।

মাটির তোকে কীভাবে পড়ার দোষি । একেকজনের পড়ানোর টেকনিক একেক রকম । শফিকের টেকনিকটা কী জানা দরকার ।

অবস্থি বলল, কোনো দরকার নেই । তাছাড়া আজ আমি পড়ব না । স্যারের সঙ্গে গফ্ফ করব ।

গফ্ফ করবি ?

স্বদলিন পড়তে ভালো লাগে না । তখন গফ্ফ করতে হয় ।

সরকরাজ বললেন, কী গফ্ফ করবি আমিও তুমি । শ্রেতা যতই ভালো হয় গফ্ফ ততই জমে ।

অবস্থি বলল, দাদাজান, আমি একেকজনের সঙ্গে একেক ধরনের গফ্ফ করি । তুমি উঠ তো ।

সরকরাজ উঠে দাঢ়িলেন । অবস্থি বলল, যাওয়ার সময় দরজাটা ভিড়িয়ে দিয়ে যাবে এবং অবশ্যই বক্ত দরজার সামনে দাঢ়িয়ে থাকবে না ।

সরকরাজ বিড়ুলিড় করে কিছু বললেন, পরিষ্কার বোবা গেল না । অবস্থি শফিকের সামনে বসতে বসতে বলল, দাদাজানের স্বতন্ত্র মাছির মতো । খুব বিরক্ত করতে পারেন ।

শফিক জবাব দিল না । কিছুক্ষণ আগে ঘটে যাওয়া ঘটনায় সে বিশ্বাত বোধ করছে । সে তার দুই পা যথাসুব্রত ভেতরের দিকে টেনে বসেছে ।

মনে করার চেষ্টা করছে—কখনো কি অবস্থির পায়ের সঙ্গে তার পা লেগেছে ?

অবস্থি কালো রঞ্জের চামড়ার ব্যাগ নিয়ে বসেছে । সে ব্যাগ খুলে পারফিউমের শিশি টেবিলে সাজাচ্ছে । অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে শফিক । অবস্থি বলল, স্যার এখানে যোলটা শিশি আছে । আপনি এছিটি পারফিউমের গুরু করবেন, তারপর বলবেন সবচেয়ে সুন্দর গুরু কোনটা, সবচেয়ে কম তালো গুরু কোনটার ।

শফিক বলল, আছ্য ঠিক আছে ।

অবস্থি বলল, আমার যোলতম জন্মদিন উপলক্ষে আমার মা যোলটা পারফিউম পাঠিয়েছেন । তিনি জানতে চেয়েছেন কোনটার গুরু আমার সবচেয়ে ভালো লাগল ।

শফিক বলল, উনি নিশ্চয়ই জানতে চান নি আমার কোনটা ভালো লাগল ।

অবস্থি বলল, উনি জানতে চান নি কিন্তু আমি জানতে চাই । আছ্য স্যার আপনি কি জামান ভাষা জানেন ?

শফিক বলল, বাংলা ভাষাই ঠিকমতো জানি না, জামান কীভাবে জানব ? কেন বলো তো ?

অবস্থি বলল, আমি একটা লেখা লিখেছি । আমার অভিজ্ঞতা নিয়ে দেখা । আমি এই সেখাটা আমার মাকে পড়াতে চাই । মা প্র্যাণিশ এবং জামান ছাড়া অন্য কোনো ভাষা জানেন না । তিনি যখন আমাকে চিঠি লেখেন তখন সেই চিঠি কাউকে দিয়ে ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়ে দেন । অবশ্য মূল চিঠি সবসময় সঙ্গে থাকে ।

শফিক বলল, আমার পরিচিত একজন আছেন, নাম রাধানাথ । তিনি পৃথিবীর অনেক ভাষা জানেন । বিবাট পঞ্চত মানুষ । তবে জামান ভাষা জানেন কি না আমার জানা নেই । আমি খোজ নেব ।

অবস্থি বলল, চুপ করে বসে থাকবেন না স্যার, গুরু পরীক্ষা শুরু করবন । স্যার ভালো কথা, আপনি কি বাসি পোলাও খান ? আমার জন্মদিনে একগুদা খাবার রাখা করা হয়েছে । তবু একজন গোট এসেছে, আর কেউ আসে নি । আপনাকে কি তিফিল কেরিয়ারে করে কিছু খাবার দিয়ে দেব ?

শফিক বলল, দাও ।

শফিক কাদেরের চায়ের দোকানে বসা । টিফিল কেরিয়ার ভর্তি খাবার নিয়ে শফিক চায়ের দোকানে এসেছে । দুজনেই অঞ্চল করে নিঃশেষে থাকছে ।

কালাপাহাড়কেও খাবার দেওয়া হয়েছে । সে পোলাও খাচ্ছে না । চোখ বক্ষ করে আরামে মাংসের হাড় চিবাচ্ছে । কাদের বলল, ভাইজান, আপনি আজিব মানুষ ।

শফিক বলল, আজিব কেন ?

খানা নিয়া আমার এইখানে চইলা আসলেন । আমি আপনার কে বলেন ? কেউ না । ভাইজান, এত আরাম কইরা অনেকদিন খান খাই না । আমি আপনারে দেশের বাড়িতে নিয়া যাব । গ্রামের নাম তলাতলি, কেন্দ্রয়া থানা । আমার ত্রী বেঙ্গল দিয়া টেংকা মাজের একটা সালুন রাবে । এমন স্বাদের সালুন বেহেশতেও নাই । আপনারে খাওয়াব । আমার সাথে দেশের বাড়িতে যাবেন না ?

শফিক বলল, যাব ।

কাদের বলল, আপনের সঙ্গে আমি তাই পাতাইলাম । আইজ থাইকা আপনে আমার ছেটভাই । আমি খুবই গরিব মানুষ । ভাইয়ে-ভাইয়ে আবার ধনী-গরিব কী ? ঠিক না ছেটভাই ?

শফিক হাসল । ○



অবস্থির লেখা

আমির দাদাজান সরকারজ খন পুলিশের এসপি হয়ে রিটায়ার করেছিলেন। আমি আমির জীবনে তাঁর মতো ভীতু মানুষ দেখি নি। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, তিনি অসীম সাহসিকতার জন্য 'পিপিএম' পেরেছিলেন। পিপিএম হলো পাকিস্তান পুলিশ মেডেল। পুলিশ সার্ভিসে সাহসিকতার সর্বোচ্চ পুরস্কার।

আমি দাদাজানকে জিজেন করেছিলাম, কী জন্মে এক বড় পুরস্কার তিনি পেয়েছিলেন? দাদাজান বললেন, ফরপেট ইট। এই বাক্যটি তাঁর খুব প্রিয়। কারণে-অকারণে তিনি বলেন, ফরপেট ইট। মেসব অশ্রে উত্তরে 'ফরপেট ইট' কিছুতেই বলা যায় না, সেখানেও তিনি এই বাক্য বলেন। উদাহরণ দেই—

আমি একদিন বললাম, দাদাজান, বাজার থেকে কই মাছ এনেছে। মটরশুটি দিয়ে রান্না করবে নাকি আলু দিয়ে?

দাদাজান বললেন, ফরপেট ইট।

১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে দাদাজান আমির জন্যে একটা বেরকা কিনে আনলেন। কঠিন বেরকা। বাইরে থেকে চোখও দেখা যায় না এমন। আমাকে বললেন, বেরকা পর। আমি বেরকা পরলাম। দাদাজান বললেন, এখন চল।

আমি বললাম, কোথায় যাব?

সোহাগী যাব। ঢাকা শহরে থাকা যাবে না। এখনই রওনা হব।

সঙ্গে আর কিছু নেব না?

দাদাজান বললেন, ফরপেট ইট।

আমি বললাম, দাঁত মাজার ত্রাশও নেব না?

দাদাজান বললেন, বেঁচে থাকলে দাঁত মাজার অনেক সুযোগ পাব। বেঁচে থাকবি কি না এটাই এখন ধৰ্ষ।

ঢাকা শহর আমরা পার হলাম রিকশার এবং পায়ে হেঁটে। কিছু কিছু বাস ঢাকা থেকে যাচ্ছিল। ঢাকা ছেড়ে যাওয়া বাসগুলিতে মিলিটারিয়া ব্যাপক তল্লাশি চালাচ্ছিল। মিলিটারি তল্লাশি মানে কয়েকজনের মৃত্যু। মেরোদের ধরে নিয়ে যাওয়া তখনো ওক হয় নি।

রিকশা ছাড়া আমি যেসব যানবাহনে আমি চড়েছি সেগুলি হচ্ছে—মহিমের গাড়ি, মোটরসাইকেল (শিবগঞ্জ থানার ওপি সাহেব মোটরসাইকেল চালিয়েছেন, তাঁর পেছনে দাদাজান এবং আমি বসেছি।) সবশেষে নৌকা। নৌকাও কয়েক ধরনের। এর মধ্যে একটা ছিল বালিটান নৌকা। এই নৌকায় পাটাতনের নিচে আমাকে দাদাজান লুকিয়ে রাখলেন। যাত্রার পুরো সময়টা তিনি আতঙ্কে অস্থির হয়ে ছিলেন। তিনি ধরেই নিয়েছিলেন আমরা এক পর্যায়ে মিলিটারির হাতে পড়ব। তারা দাদাজানকে গুলি করে মারবে এবং আমাকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে। দাদাজান দিনের মধ্যে অনেকবার অজু করতেন। তিনি চাহিলেন যেন পরিত্র অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

আমরা তিন দিন পর সোহাগী পৌছালাম। নদীর পাড়ে দোতলা দালান। বাবার সঙ্গে এই বাড়িতে আগে আমি দু'বার এসেছি।

দাদাজানের এই বাড়ি পুরোনো ধরনের, তবে যথেষ্টই সুন্দর। দোতলায় টুলা বারান্দা আছে। টিমারের ডেকে বসলে যেমন সারাক্ষণ অবল হাওয়া গায়ে লাগে, বারান্দায় দাঁড়ালেও তা-ই। সারাক্ষণ হাওয়া বইছে। বাড়ির তিনদিকেই কলের বাগান। লিচগাছ থেকে ওক করে তেক্তুলগাছ সবই সেখানে আছে। দাদাজানের ওই বাড়িতেই আমি জীবনের অথম গাছ থেকে নিজ হাতে পেড়ে লিচু খেয়েছি। লিচু যিষ্ঠি না, টক। লবণ দিয়ে খেতে হয়।



আমাদের বাড়ির সামনের নদীর নাম তরাই । এই নদী ব্রহ্মপুত্রের শাখা । বর্ষায় পানি হ্যায় । শীতের সময় পায়ের পাতা ভেজার মতো পানি থাকে । সেবার তরাই নদীতে প্রচুর পানি ছিল । জেলেরা সারাদিনই জাল ফেলে মাছ ধরত । তরাই নদীর বেয়াল মাছ অত্যন্ত সুস্বাদু । জেলেরা ভোরবেলায় মাছ দিয়ে যেত । নদীনের মাছ । রান্না করতেন ধীরেন কাকু । উনি হিন্দু ব্রাহ্মণ ছিলেন । পরে মিলিটারির হাতে মারা যান । দাদার বাড়ির আশপাশে প্রচুর আঁশীয়জঙ্গ থাকার কথা । তা ছিল না । কারণ দাদাজানের বাবা (জাস্টিস মুনশি) পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসেক দূরে এই বাড়ি করেছিলেন । পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে তার উপর ছিল না । তিনি তার বড় ভাইয়ের স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন । ওই মহিলার ছবি আমি দেখেছি । তিনি ছিলেন কদাকার । উচ্চ হনু । দাত বের হওয়া । গায়ের রঙ পাতিলের ভলার মতো কালো । কী দেখে তিনি এই মহিলার প্রেমে পড়েছিলেন তা এখন আর জানার উপর নেই ।

দাদাজানের বাড়িতে কেয়ারটেকার সেন কাকা ছাড়াও ছিলেন ধীরেন কাকার জ্ঞান বাবা । উনি কুণ্ঠবৰ্তী ছিলেন । সারাকষণই বাড়ি পরিকল্পন রাখার কাজকর্ম নিয়ে থাকতেন । এই দুজন ছাড়াও দুবির নামের মধ্যবয়স্ক একজন ছিলেন, যার কাজ গাছপালা দেখা । বাগান করা ।

ওই বাড়িতে আমার সময় খুব ভালো কাটছিল । আমি বাগানে দিবির চাচাকে দিয়ে দেলনা টানিয়েছিলাম । দেলনা দুলতে দুলতে গঞ্জের বই পড়তাম । দাদাজানের লাইব্রেরিতে চামড়ায় বাঁধানো আসেক বই ছিল । বেশিরভাগই ইহুবালি । রবীন্দ্রনাথের নেকটারিবি উপন্যাস আমি দাদাজানের বাগানের দোলনায় দুলতে দুলতে পড়েছি ।

ধীরেন কাকা আমাকে রান্না শেখাতেন । অধ্যাপকের ভঙ্গিতে বঙ্গুত্তা দিয়ে রান্না শেখানো । এই সময় বাবা কাকি তার পাশে থাকতেন । রান্নার বঙ্গুত্তা ওমে পিচিমিটি হস্তানে ।

মা! সবচেয়ে কঠিন রান্না মাছ রান্না । মাছের আছে অঁশটে গুঁচ । রান্নার পর মদি মাছের অঁশটে গুঁচ থাকে, তখন সেই মাছ হয় ভৃত-পেঁচুরি খাবার । অথবেই অঁশটে গুঁচ দূর করবে ।

কীভাবে?

প্রথমে লবণ মেখে কচলাবে । তারপর পানি দিয়ে ধূয়ে লবণ ফেলে দেবে । এরপর দিবে লেবুর রস । কাগজিলেবু হলে ভালো হয় । এই লেবুর গুঁচ কড়া । লেবুর রস দিয়ে মাখানোর পর আবার পানি দিয়ে ধূয়ে ফেলে দেবে । সব মিলিয়ে তিনি খেয়া । এর বেশি না । যাংসের ক্ষেত্রে ভিন্ন ব্যবস্থা । মাত্র এক খোৰা ।

রান্না বিষয়ে ধীরেন কাকার সব কথা আমি একটা ঝল্টনা খাতায় খুব ওছিয়ে লিখেছিলাম । খাতাটা হারিয়ে গেছে । খাতাটা থাকলে রান্নার একটা বই লেখা যেত ।

রাধা কাকি ছিলেন ভৃতের গঞ্জের ওতাদ । তার কাছ থেকে কত যে গঞ্জ শুনেছি । বেশিরভাগ গঞ্জই বাস্তব অভিজ্ঞতার । তিনি নিজে দেখেছেন এমন । তার কথার সব ভৃত ভীতু অক্তির । মানুমের ভয়ে তারা অস্তির । ওথু একশুলীর পিশাচ আছে, যারা মানুষকে মোটেই ভয় পায় না । এরা হিন্দু জন্মের মতো ।

আমি কল্পনা, কাকি, আপনি এই ধরনের পিশাচ দেখেছেন?

কাকি বললেন, একবার দেখেছি । আমি এই বাড়ির বারান্দার বসা । সক্ষা মিলিয়েছে, আমি বড়বারে হারিকেনে জালিয়ে বারান্দায় এসেছি, তখন দেখলো পানির নিচ থেকে পিশাচটা উঠল । ধপ ধপ শব্দ করে সিঁড়ি ভেঙে উঠে এসে উঠানে দাঢ়াল । মুখ দিয়ে ঘোড়ার মতো শব্দ করল ।

দেখতে কেমন?

মানুষের মতো । মিশমিশা কালো । হাতের আঙুল আসেক লো । আঙুলে পাখির নখের মতো নখ । পিশাচটা দেখে তারে আমি অজ্ঞান হয়ে যাই—এই সময় একটা কুকুর ছুটে এল । কুকুর দেখে পিশাচটা তার পেঁয়ে দৌড়ে পানিতে নেমে ডুব দিল । পিশাচটা কিছুই ভয় পায় না, ওথু কুকুর ভয় পায় । কুকুর তাদের কাছে সাক্ষাৎ যথ ।

দাদাজানের সঙ্গে আমার তেমন কথা হতো না । তিনি সারাক্ষণ ট্রানজিটারে খবর বলতেন । মাঝে মাঝে তিনি মাইল দূরে হামিদ কুতুবি নামের এক পীর সাহেবের আভানায় দেখেন । তিনি এই পীরের মুরিদ হয়েছিলেন । যখন ট্রানজিটার খলতেন না, তখন পীর সাহেবের দেওয়া দেয়া জগ করতেন । দাদাজান আভক্ষণ্য ছিলেন । প্রতিদিনই তার আক্ষণ্য বাড়ত । ভবিষ্যৎ জনার জন্যে তিনি এক রাতে ইন্দ্রেখারা করলেন । ইন্দ্রেখারা দেখলেন, একটা প্রাকাও কালো শুকুন টেটো দিয়ে আমার চুল কামড়ে ধরে আকেষে উঠে গেছে । আমি চিক্কার করছি, 'বাচাও! বাচাও'!

দাদাজানের পীর হামিদ কুতুবি স্পের তাবীর করলেন । কী তাবীর তা দাদাজান আমাকে বললেন না, তবে তিনি আরও অস্তির হয়ে পড়লেন । চারদিক থেকে তখন ভৱংকর সব খবর আসতে শুরু করেছে । মিলিটারিরা গান্দেবট নিয়ে আসছে, বাড়িগুল জালিয়ে দিচ্ছে, নির্বিচারে মানুষ মারছে, অঞ্চলব্যবসী মেয়েদের উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এইসব ।

একসময় আমাদের অঞ্চলে মিলিটারি চলে এল । খাতিমনগুলে মিলিটারির গান্দেবট ভিড়ল । দাদাজানের বাড়ি থেকে খাতিমনগুল বাজার

দু'মাইল দূরে । খবর শোনামাত্র দাদাজান আমাকে নিয়ে তার পীর সাহেবের হজরাখানায় উপস্থিত হলেন ।

বিশাল এলাকাজুড়ে পীর সাহেবের হজরাখানা । চারদিকে দেয়াল, দেয়ালের উপর কাটাতার । দুর্গের মতো ব্যাপার । ভেতরে দুটা মসজিদ আছে । একটি ছেলেদের একটি মেয়েদের । হজরাখানার পেছনে পীর সাহেবের দোতলা বাড়ি । একতলায় থাকেন পীর সাহেবের প্রথম স্তুরী । তার কোনো সত্ত্বানি নেই । দোতলায় থাকেন পীর সাহেবের দ্বিতীয় স্তুরী । তার নাম জুলখা । এই স্তুরী গতে একটি সত্ত্বানি আছে । তার নাম জাহাঙ্গীর । তিনি কেবানে হাফেজ । কুগবল এক সুবক । নত্র এবং ভদ্র । তার সঙ্গে বেশ কয়েকবার আমার দেখা হয়েছে । তিনি কখনো মাথা তুলে তাকান নি ।

আমি পীর সাহেবের সামনে বসে আছি । আমার পাশে দাদাজান । পীর সাহেব নামাজের ভঙ্গিতে বসেছেন । তার বয়স আসেক, তবে তিনি শারীরিকভাবে মোটেই অশক্ত না । পীর সাহেবের ভালহাতে তসবি । তসবির দানাগুল আসেক বড় বড় । তিনি তসবি টেনে যাচ্ছে । ঘরে আরও কয়েকজন ছিল । পীর সাহেবের নির্দেশে তারা বেরিয়ে গোল । একজন এসে ফরসি হকা দিয়ে গোল । পীর সাহেব হকায় টান দিতে দিতে বললেন, সরফরাজ! তোমার এই নাতনির মা বিদেশিনী সেটা জানলাম । তার র্ধম কী?

ত্রিষ্ঠান ।

পীর সাহেব বললেন, মুসলমান ছেলে ত্রিষ্ঠান বিবাহ করতে পারে । নবিজী মরিয়ম নামে এক ত্রিষ্ঠান কল্পাকে বিবাহ করেছিলেন । এখন আমার প্রথ, তোমার পুত্রের সঙ্গে ত্রিষ্ঠান মেয়ের বিবাহ কি ইসলাম ধর্মসভতে হয়েছে?

জি হজুর ।

আলহামদুল্লাহ । এটা একটা সুস্বাদ । তুম তোমার নাতনিকে আমার এখানে রাখতে চাও?

জি জনাব ।

মেয়েরে বাবা কোথায়?

মেয়েরে বাবা কোথায় আমি জানি না । আমার ছেলে তিনি বাজ বয়সের মেয়েকে এনে আমার কাছে রেখে শেষে চলে যায় । এরপর আর তার খোজ জানি না ।

সে কি জীবিত আছে?

তাও জানি না ।

পীর সাহেব বললেন, জিলের মাধ্যমে তোমার পুত্রের সংবাদ আমি এনে দিতে পারি । সেটা পরে দেখা যাবে । এই মেয়ের নাম কী?

অবতি ।

এটা কেমন নাম ?

তার বাবা থেকেছে ।

সন্তানের সুন্দর ইসলামী নাম রাখা মুসলমানের কর্তব্য । আমি এই মেয়ের নাম রাখিলাম, মায়মুনা । মায়মুনা নামের অর্থ ভাগ্যবতী ।

দাদাজন চুপ করে রাইলেন ।

পীর সাহেবের আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি কি কোরান মজিদ পাঠ করতে পার ?

আমি বললাম, পারি ।

অজু আছে ?

জিন্না ।

যাও অজু করে এসে আমাকে কোরান মজিদ পাঠ করে শোনাও ।

আমি কোরান শরিফ পড়লাম । পীর সাহেবের বললেন, পাঠ ঠিক আছে । তুরুর আলহামদুলিল্লাহ । সরফরাজ, তোমার নান্তি মায়মুনাকে আমি জুলেখার হাতে হাজুল করে দিব । সে নিরাপদে থাকবে । তাকে কঠিন পর্দার ভেতর থাকতে হবে ।

দাদাজন বললেন, আপনি যেভাবে বলবেন সেভাবেই সে থাকবে ।

পীর সাহেবের কাছে থাকার সময়ই থবর পেলাম, দাদাজনের বাড়িতে মিলিটারি এসে উঠেছে । মিলিটারি ক্যাপ্টেন ঘাটি হিসেবে বাড়ি পছন্দ করেছেন । তাদের নিরাপত্তা জন্যে বাড়ির চারদিকের সব গাছপালা কাটার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । ধীরেন কাকা এবং তার জ্ঞাকে যে মিলিটারিবা গুলি করে মেরে ফেলেছে—এই থবর তখনো আসে নি ।

দাদাজন আমাকে রেখে চলে গেলেন । যাওয়ার আগে অনেকক্ষণ জড়িয়ে ধৰে কাঁদলেন । আমার হাতে এক শ' টাকার মোটে দুই হাজার টাকা দিলেন এবং আমাকে অবাক করে দিয়ে বললেন, আমার ব্যক্তিগত পিস্তলটা তোকে দিয়ে যাচ্ছি । তালো করে দেবে নে । বারো রাউন্ড গুলি ভরা আছে । সেক্ষতি ক্যাচ লাগানো অবস্থার দ্বিগুর চাপলে গুলি হবে না । সেক্ষতি ক্যাচ কীভাবে খুলতে হব দেখ । এই ভাবে ।

আমি বললাম, সেক্ষতি ক্যাচ খোলার কায়দা জেনে আমি কী করব ? কাকে আমি গুলি করে মারব ?

দাদাজন বললেন, কাউকে মারবি না । জিনিসটা জন্ম থাকল ।

আমি বললাম, তুমি কোথায় যাবে ?

দাদাজন বললেন, জানি না কোথায় যাব । ঢাকায় থেকে পারি ।

মিলিটারিবা তোমার বাড়ি দখল করে বসে আছে । তাদের কিছু বলবে না ?

না ।

পীর সাহেবের এই বাড়িতে আমি কতদিন থাকব ?

মিলিটারির গুটি বিদায় না হওয়া পর্যন্ত থাকবি । আমি মারো মধ্যে এসে থেঁজ নিব । পিস্তলটা লুকিয়ে রাখবি । পিস্তলের বিষয়টা কেউ যেন না জানে ।

কেউ জানবে না ।

পীর সাহেবের বাড়িতে আমার জীবন শুরু হলো । খুব যে কঠকর জীবন তা-না । দেতেলুর সর্ব উন্নতের একটা ছোট ঘর আমাকে দেওয়া হলো । ঘরে আমি একাই থাকি । ওপুর রাত্রে ময়না নামের মধ্যবয়স্ক এক দাসী মেঝেতে পাটি পেতে যুক্ত । ময়নার চেহারা কদাকরা । মুখে বসন্তের দাগ, একটা চোখ নষ্ট । মানুষ হিসেবে সে অথর্ম শ্রেণীর । অথর্ম রাতেই সে আমাকে বলল, আমাজি আপনি তুম খাইলেন না । আমি আছি ।

আমি বললাম, ভয় পাব কী জন্মে ?

ময়না বলল, আপনার ব্যাস অল্প । আপনে দুরের মতো সুন্দর । কিংবা কে বলবে দুরের চেয়েও সুন্দর । আমি তো আর হুর দেখি নাই । আপনের মতো মেরেছেলোর কাঁইকে কাঁইকে (কদমে কদমে) বিপদ । আপনে সাবধানে চলবেন । আমার একটাই নয়ন । এই নয়ন আপনার উপর রাখলাম ।

আমি বললাম, একটা নয়ন আমার উপর রেখে দিলে কাজকর্ম করবেন কীভাবে ? তারচেয়েও বড় কথা, নয়ন আপনি আমার উপর রাখলেন কী জন্মে ?

ময়না বলল, ছোট মাঝে হকুম ।

ছোট যা হলো পীর সাহেবের বিত্তীয় জীৱি । এই মহিলা আরামে এবং আলসে সময় কাটান । বেশিরভাগ সময় চুল এলিয়ে উনু হয়ে বসে থাকেন । একজন দাসী তাঁর তুলে বিলি করে দেয় । তুলের উনুন বাছে । সঞ্চারে দুলিন বাটা মেদি মাথায় দিয়ে দেয় । আরেকজন দাসী তাঁর পায়ের পাতায় তেল ধায়ে । এই দাসীরাই তাঁর কাজা নামাজ আদায় করে ।

এই অস্তুত মহিলার উপর প্রতি অমাবশ্য রাতে কিসের মেল আছে হয় । তখন তিনি যৌথে শুরু করতে থাকেন । তাঁর মুখ দিয়ে লালা পড়ে । তিনি পুরুষের গলায় বলেন, শহিল গরম হইছে । শহিলো পানি দে । বরকপানি দে । তখন তাঁর গায়ে বালতি বালতি বরকপানি চালা হয় । অমাবশ্য উপলক্ষ করেই বরকপাল থেকে চাক চাক বরক কেলা হয় । আচ্ছণ্যস্ত অবস্থায় তাঁর তিনি দাসী ছাড়া কেউ তাঁর সামনে যাব না ।

পীর বাড়িতে আমার জীবনযাত্রাটা বলি । সূর্য ঘোর আগে ময়না আমাকে ঢেকে তোলে ।

আমাকে ঘাটে নিয়ে যাব অজু করার জন্মে ।

ফজরের আজানের পরপর নামাজের জন্মে দাঢ়াতে হয় । ইমামতি করেন পীর সাহেব । মেরোদের এবং বারো বছরের নিচের বালকদের অলাদা নামাজের বাবস্থা । পুরুষদের নামাজ এবং মেরোদের নামাজ একসঙ্গেই হয়, তবে মাঝামাজে দেখতে পারে না, তবে তাঁর কথা শুনতে পারে ।

ফজরের নামাজের পরপর মেরোর যে যাব ঘরে চলে যায় । এই সময় বাধা তামুলকভাবে সবাইকে কোরান পাঠ করতে হয় । সকালে নাশতার ভাক এলে কোরান পাঠ বন্ধ হয় । নাশতা হিসেবে থাকে রাতের বাসি পোলাও এবং বাসি মাস ।

জোহরের নামাজের পর দুপুরের যাওয়ার ভাক আসে । দুপুরে গণ্যবাবুর বাল্লা হয় । প্রতিবারই দেড় শ' থেকে দু' শ' মাসুম যাব । বাড়ির মেরোদের জন্মে এই খাবার খেতে পারে কিংবা নিজেদের জন্মে মাছ, ভাল, সবজি ও খেতে পারে ।

এশীয় নামাজের পর রাতের খাবার । পীর বাড়ির বাইরের কেউ খেতে পারে না । জিন্না রাতের খাবারে অংশগ্রহণ করে বলে (?) রাতে সবসময় পোলাও এবং মাস থাকে ।

আমি ময়নাকে বললাম, জিন্না রাতে খেতে আসে ?

ময়না বলল, আসে । পীর বাবার জিন্ন সাধন । এই কাগেই আসে । মাসে একবার জিন্ন মিলাদ পঞ্চায় । আপনি জিন দেখেছেন ?

আমি জিন দেখি নাই, তব একবার তারার মিলাদে ছিলাম । জিনের কানক্যান মেরেছেলোর মতো গলা । মিলাদের শেষে জিন মুলুকের তবারক ছিল । সবজ কিমিলি ।

খেতে কেমন ?

মিটি, তব সামাজ্য বাল ভাবও আছে । আপনে যখন আছেন, তখন জিনের মিলাদ নিজের চাটুরে দেখবেন । জিন মুলুকের ফল ফ্রুট ইনশাল্যাহ থাকবেন ।

পীর বাবার সঙ্গে এক সক্ষ্যাবেলায় মিলিটারি ক্যাপ্টেন ইশতিয়াক খাল দেখা করতে এলেন । জিনের মিলাদ দেখার জন্মে আভারিক আঘাত প্রকাশ করলেন । পীর বাবা ক্যাপ্টেন সাহেবের আগমন উপলক্ষে বিশেষ খাবারের আয়োজন করলেন । ক্যাপ্টেন সাহেবের আগমন উপলক্ষে বিশেষ খাবারের আয়োজন হলো । দুটি খাসি জেবে করা হলো । খাসির রেজালা, মুরগির রোটি এবং পোলাও ।

ক্যাপ্টেন সাহেবের উপস্থিতির কারণে জিনের মিলাদে বাড়ির মেরোর উপস্থিতি থাকতে পারল



না । ক্যাটেন সাহেবের জিনের মিলান দেখে হতভব হয়ে গেলেন । তিনি ধায়ই পীর বাবার হজরাখানার অসমত শুরু করালেন ।

সারা দেশে তখন ভয়ঙ্কর অবস্থা চলছে । দেশের মানুষ জীবন বাঁচানোর জন্যে পালিয়ে ইডিয়া চলে যাচ্ছে । মিলিটারিয়া নির্বিচারে মানুষ মারছে, মেরোদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে, আর আমরা আছি পরম সুর্খে । পীর বাবার হজরাখানা সমস্ত বাসেলা থেকে মুক্ত । এখনে প্রতি জুয়াবারে পাকিস্তানের জন্যে দোয়া হয়, মিলান হয় । একবার খবর পাওয়া গেল, জিনেরা বাদগাদে বড় পীর সাহেবের মাজারে মিলান করেছে । তারা জানিয়েছে, বালাদেশ কখনো স্বাধীন হবে না । দুর্ভিকারীয়া সবাই মারা পড়বে । জিনেরা নাকি মানুষের চেয়ে কিছু কিছু বিষয়ে উন্নত । তারা ত্বরিয়াৎ দেখতে পারে ।

জুন মাসের আট তারিখ দুপুরে পীর বাবা আমাকে ডেকে পাঠালেন । তার মুখ অস্বাভাবিক গঁড়িয়ে । হজরাখানায় তিনি ছাড়া আর কেউ নেই । তার এক হাতে তসবি অন্য হাতে হক্কার নল ।

পীর বাবা বললেন, তোমার সঙ্গে কি কখনো পাকিস্তান মিলিটারির ক্যাপ্টেন ইশতিয়াকের দেখা হয়েছে ?

আমি বললাম, না ।

পীর বাবা বিবরণ গলায় বললেন, ভাবনাচিত্ত করে জবাব দাও । তিনি অবশ্যই তোমাকে দেখেছেন । তুমি আমরাগামে আম কুড়াতে পিয়েছিলে । তোমার সঙ্গে আরেকজন ছিল ।

জি । মহলা ছিল । আমরা পেছনের গেট দিয়ে বাগানে গিয়েছিলাম ।

বেরকা ছিল না ?

জি-না ।

ক্যাটেন ইশতিয়াক তোমাকে দেখেছেন এবং আমার কাছে বিবাহের পরগাম পাঠিয়েছেন । তুমি দেশের অবস্থা জানো না । দেশের যে অবস্থা তাতে পাকিস্তান মিলিটারির প্রতি অস্থায় করা অসম্ভব ।

আমি চুপ করে বসে আছি । পীর বাবাও চুপ করে আছেন । তামাক টেনে যাচ্ছে । একসময় তিনি নীরবতা সঙ্গ করে ছোট নিশাচ ফেলে বললেন, আমি ক্যাটেন সাহেবকে বলেছি এই মেসেন্টির আমার ছেলে জাহাসীরের সঙ্গে বিবাহ হয়েছে । মিথ্যা কথা বলেছি । মহা বিপদে জীবন রক্ষার জন্যে মিথ্যা বলা জানো আছে । তোমাকে যে কোথাও পাঠাব সেই উপর নেই । তোমার পিতা কোথায় আছেন তাও জানি না । এমন অবস্থায় জাহাসীরের সঙ্গে তোমার বিবাহ দেওয়া ছাড়া আমার উপর নাই । আগামী শুক্রবারে বাদ জুয়া তোমার বিবাহ । এখন সামানে থেকে যাও । একটা কথা মনে রাখবা, যা ঘটে আল্লাহপাকের

হক্কমেই ঘটে । তার হক্কমের বাইরে যাওয়ার আমাদের কোনো উপর নাই । জাহাসীরের সঙ্গে তোমার বিবাহ আল্লাহর হক্কমেই হবে । আমার হক্কমে না ।

আমাকে ঘরে তালাবন্ধ করে রাখা হলো । তত্ত্বাবার বাদ জুয়া দশ হজার এক টাকা কাবিনে আমার বিয়ে হয়ে গেল । এতদিন জানতাম মেয়ে তিনবার কবুল না বলা পর্যন্ত কবুল হয় না । সেদিন জানলাম লজ্জালশত যেসব নারী কবুল বলতে চায় না, তারা সেহেলের উপর রাখা কোরান শরিফ তিনবার স্পর্শ করলেই কবুল হয় ।

আমার হাত ধরে তিনবার কোরান শরিফ ছুঁয়ে দেওয়া হলো ।

বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ হতে হতে মাগারেরে নামাজের সময় হয়ে গেল আর তখন শুরু হলো নামান কামেলা । একদল মুক্তিযোক্তা হজরাখানা লক্ষ্য করে এলোপাথারি ওলি করা শুরু করল । মুক্তিযোক্তা নামে একটা দল মে তৈরি হয়েছে তারা যুক্ত শুরু করেছে—এই বিষয়ে আমি কিছুই জিজ্ঞাস না ।

মুক্তিযোক্তা কিছুক্ষণ ওলি করে চলে গেল । তাদের ওলিতে কারও কিছু হলো না, শুধু ইরাজ মিয়া নামের একজনের হাতেরে কজি উড়ে গেল । সে বিকট চিংকার শুরু করল, আঘাজি আমারে বাঁচান । আঘাজি আমারে বাঁচান । মুক্তিযোক্তাদের ভয়ে কেউ তাকে হাসপাতালে বা ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল না ।

ক্যাটেন ইশতিয়াক জিপে করে দলবল নিয়ে এলেন । মিলিটারিয়া আকাশের দিকে ঝাঁকে ঝাঁকে ওলি ছুড়ে চলে গেল ।

আমাবশ্য ছাড়াই জুলেখা বিবির উপর জিনের আছুর হলো । আজকের আছুর অন্য দিনের চেয়েও ভয়াবহ । তিনি পুরুষের গলায় চেঁচাতে লাগলেন, শহীল জুইলা যায় । বৰফপালি দে । বৰফপালি দে ।

একতলার একটা বড় ঘরে পালংকের উপর আমি বসে আছি । স্বামীর জন্যে অপেক্ষা । এই ঘরেই বাসর হবে । ঘরে আগবন্ধতি জুলানো হয়েছে । বাসরের আরোজন বলতে এইচুকুই ।

আমার স্বামী হাফেজ মোহাম্মদ জাহাসীয় এলেন শেষবর্তো । তাকে বিশ্বত এবং ক্লান্ত দেখাচ্ছে । তিনি খাটো বসতে বসতে কয়েকবার হাই তুললেন । আমি সহজ ভঙ্গিতে বললাম, ইরাজ মিয়ার চিংকার শেলা যাচ্ছে না । সে কি মারা গেছে ?

তিনি হাঁ-সূচক মাথা নেড়ে বললেন, হঁ । সবই আল্লাহর ইচ্ছা । উনার ইচ্ছা ছাড়া কিছুই হয় না ।

আমি বললাম, এখন আপনাকে একটা জিনিস দেখাব । আপনি ভয় পাবেন না । ভয়ের কিছু নাই ।

এই দেশখন এটা একটা পিণ্ডল । এখানে বারো রাত্তি ওলি ভরা আছে । সেফটি ক্যাচ লাগানো বলে ট্রিগার টিপলেও ওলি হবে না । এই দেশখন আমি সেফটি ক্যাচ খুলে ফেললাম । এখন ট্রিগার টিপলেই ওলি হবে ।

তিনি এতটাই হতভব হলেন যে, তার ঠেঁট নড়ল কিন্তু কোনো শব্দ বের হলো না । আমি বললাম, এখন আমি যদি ওলি করি তাহলে অচি শব্দ হবে কিন্তু কেট এখানে আসবে না । সবাই ভবাবে মুক্তিবাহিনী আবার আক্রমণ করবে ।

তুমি ওলি করবে ?

আমি বললাম, ভোর হতে বেশি বাকি নাই । আপনি আমাকে যদি লুকিয়ে টেশনে নিয়ে ঢাকার ট্রেনে তুলে দেন তাহলে ওলি করব না । যদি রাজি না হন অবশ্যই ওলি করব । এতে মন খারাপ করবেন না । যা ঘটবে আল্লাহর হক্কমেই ঘটবে । আর আপনি যদি আমাকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেন, সেটাও করবেন আল্লাহর হক্কমেই ।

তিনি স্মৃতির মতো বসে আছেন । তার দৃষ্টি আমার হাতে ধরে রাখা পিণ্ডলের দিকে । তিনি খুব যামজেন । মাঝে মাঝে হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছছেন ।

ফজরের আজান হলো । তিনি বললেন, চলো তোমাকে নিয়ে শ্যামগঞ্জের দিকে গুরুনা হই । সকাল নয়টায় একটা ট্রেন তৈরি হয়ে ঢাকার যায় ।

তিনি আমাকে শ্যামগঞ্জের ট্রেনে তুলে দিয়ে চলে যেতে পারতেন । তা করলেন না, আমার সঙ্গে রওনা হলো । একজন স্বামী তার ত্রুটীক হটটা যন্ত্র করে ততটাই করলেন । ট্রেনের কামরা ফাঁকা ছিল । তিনি আমাকে বেঁকে পা ছড়িয়ে ওল্লে যুক্ত বললেন । আমি তা-ই করলাম । পথে কোনো মিলিটারি চেকিং হলো না । কিংবা হাততো হয়েছে, আমি যুগিয়ে ছিলাম বলে জানি না ।

ঢাকার পৌছান বিকেলে । তখন ভারী বর্ষণ হচ্ছে । বাতাস হাঁটুপানি । বিকশায় ভিজতে ভিজতে বাড়ির দিকে যাচ্ছি । আমার স্বামী বললেন, আমার কিন্তু ফিরে যাওয়ার ভাড়া নাই ।

আমি জবাব দিলাম না ।

আমাদের বাড়ি শেট খোলা । বাড়ির দরজা ভেতর থেকে বুক । অনেকক্ষণ দরজা ধাক্কানোর পর দানাজান ভীতমুখে দরজা খুললেন । তিনি দাঢ়ি রেখেছেন । মুখভর্তি দাঢ়ির জঙ্গলে তাকে চেনা যাচ্ছে না । আমাকে দেখে তিনি ভৃত দেখার মতো চমকে উঠলেন । টেনে ঘরে চুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন । আমার মনেই হলো না একজন মানুষ গেটের বাইরে দাঢ়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজছে । তার ফিরে যাওয়ার ভাড়া নাই । ০

একটি বিশেষ গুজবের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে আনন্দময় চাপা উত্তেজনা। সাধীম বাংলাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন উৎসব হতে যাচ্ছে। উৎসবের প্রধান অতিথি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। শোনা যাচ্ছে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা করা হবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা আলাদা মর্যাদা পাবেন। তাঁদের বেতন বৃদ্ধি ঘটবে। সবার বাসস্থানের বাবস্থা করা হবে। যারা বাসা পাবেন না, তাঁদের এমনভাবে বাড়িভাড়া দেওয়া হবে যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশেই বাড়ি ভাড়া করে থাকতে পারেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা হবেন অতিরিক্ত মর্যাদার শিক্ষক।

এখানেই শেষ না, আরও আছে—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকেই প্রস্তাব করা হবে যেন বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের আজীবন প্রেসিডেন্স হন। বঙ্গবন্ধু এই প্রস্তাব বিনয়ের সঙ্গে মেনে নেবেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এত কিছু পাচ্ছেন, তার বিমিময়ে কিছু তাঁদের দিতে হবে। এটাই অন্তর্ভুক্ত এবং শিষ্টতা। শিক্ষকরা সবাই এমন বঙ্গবন্ধুর 'বাকশাল'-এ বোগদান করবেন। সব শিক্ষকের বাকশালে যোগদানের অঙ্গীকারনামা একটি কৃপার নোকার খোলের ভেতর ভরে সমাবর্তন অনুষ্ঠানেই বঙ্গবন্ধুর হতে তুলে দেওয়া হবে।

শিক্ষকদের বাকশালে যোগদানের অঙ্গীকারনামায় দস্তাখত সংযোগ এর মধ্যেই সম্পত্তি হয়েছে। তাঁদের মধ্যে অংশহীন কোনো ক্ষমতি দেখা পেল না। ক্ষমতার সুন্দরীর ধার্কা ভাগোর ব্যাপার। হাতেগোলা কিছু শিক্ষক অবশ্যি বাকশালে যোগদানে রাজি হলেন না। তাঁরা ভাতীত এবং চিন্তিতমুখে সময় কাটাতে লাগলেন। এদের একজন আমি, রসায়ন বিভাগের সামান্য লেকচারার। আমি কেন উচ্চী শীত গাইলাম তা নিজেও জানি না। বহুবৰ্ষীয় গাঢ়তত্ত্ব, একদলীয় গাঢ়তত্ত্ব বিষয়গুলি নিয়ে কখনো চিন্তা করি নি। আমার প্রধান এবং একমাত্র চিন্তা লেখালেখি। তিনটি উপন্যাস বের হয়ে গেছে। চূর্ধ্ব উপন্যাস 'অচিনপুর' রাত জেপে লিখছি। আমাকে ডেকে পাঠালেন অধ্যাপক আলী নওয়াব। ছাত্রবস্থায় তাঁকে যমের মতো তা পেতাম। শিক্ষক হয়ে সেই ভ্যাকাটে নি, বরং বেড়েছে। ছাত্রবস্থায় অনেকের ভিত্তে লুকিয়ে থাকা যেত। এখন তা সম্ভব না। তাঁর সঙ্গেই ফিজিক্যাল কেমিট্রি থাকটিক্যাল ক্লাস নেই। আমাকে সরাক্ষণ তাঁর নজরদারিতে থাকতে হয়।

দুপুরের দিকে নওয়াব স্ন্যানের আলসারের ব্যথা ওঠে। তাঁর মেজাজ তুঙ্গে অবস্থান করে। আমি তুঙ্গস্পর্শ মেজাজের সামনে দাঢ়িলাম। স্ন্যান বললেন, বলো। আমার সামনে এসে দাঢ়িয়ে থাকবে না। চেয়ার টেনে বসবে। তুমি এখন আমার ছাত্র না, কলিং।

আমি বসলাম। স্ন্যান বললেন, দুঃখজনক হলেও একটা সত্যি কথা শোনো। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা হলেন অমেরুদণ্ডী প্রাণী। অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের স্ন্যানের সঙ্গে থাকতে হয়। কী বলছি বুবাতে পারছ?

আমি বললাম, পারছি।

মা ও জানকরের সঙ্গে দেখা করো। সে মা বলবে সেইভাবে কাজ করবে।

আমি বললাম, স্ন্যান। অবশ্যই।

অধ্যাপক জানক মাহমুদ আমার সরাসরি শিক্ষক। তিনি ক্যাম্পাইজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে

পিএইচডি করেছেন। ডিপ্রিল সঙ্গে প্রাইটেনদের কিছু স্বত্ত্বাবও নিয়ে এসেছেন। সারাজ্ঞ সঙ্গে ছাতা রাখেন। রিকশায় যখন উঠেন, রিকশার হড় ফেলে ছাতা মেলে বসে থাকেন।

এই মেদালী অধ্যাপক মানুষ হিসেবে অসাধারণ। তিনি বিড়ালপ্রেমিক। তাঁর ঘৰভৰ্তি বিড়াল। এর মধ্যে একটি বিড়াল অক্ষ। বিড়ালটি তাঁর অসম্ভব থিএ। নিজের শোবার বিছানা তিনি এই অক্ষ বিড়ালের জন্যে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

জাফর স্যার সম্পর্কে একটি গভীর আগে বলে নেই। এতে মানুষটি সম্পর্কে সবাই কিছু ধৰণে পাবেন। তাঁর গাড়ি নেই, সবসময় রিকশায় চলাচল করেন। একদিন তিনি রিকশা থেকে নেমে ভাড়া দিতে গিয়ে দেখেন রিকশাওয়ালার সিটে রাজের দাগ। স্যার বললেন, এখনো রঞ্জ কেন ?

রিকশাওয়ালা জানাল, কিছুদিন আগে তাঁর পাহলাদের অপারেশন হয়েছে। ডাক্তার পনেরো দিন রিকশা চলাতে নিয়ে করেছে, কিন্তু তাঁর সঙ্গের অচল বলে বাধ্য হয়ে রিকশা নিয়ে বের হয়েছে।

স্যার সেদিনই বেতন তুলেছে। বেতনের পুরো টাকাটি রিকশাওয়ালার হাতে দিয়ে বললেন, এই টাকার সংস্কার চলাবে। পুরোপুরি সুন্ধ না হয়ে রিকশা চলাবে না—এটা আমার অঙ্গর।

যাই হোক, আমি জাফর স্যারের সঙ্গে দেখা করলাম। স্যার বললেন, তুমি এখনো পিএইচডি করো নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টারি করতে হল এই ডিপ্রি লাগবেই। তুমি যে কাও করেছ, এতে সরকারের কাছে দেখাই হয়ে যেতে পার। তখন ক্ষমার শিপের ও সমস্যা হবে। আমার আদেশ, তুমি বাকশালের কাগজগুচ্ছ সই করবে।

আমি বললাম, আপনার আদেশের বাইরে যাওয়ার অশুই ওঠে না।

বাকশালে যোগদানের কাগজে স্বত্ত্বাত করার জন্যে রসায়ন বিভাগের অফিসে গেলাম। আমাকে জানানো হলো কাগজগুচ্ছ রেজিস্ট্রের অফিসে চলে গেছে। রেজিস্ট্রের অফিসে গিয়ে জানলাম সব কাগজগুচ্ছ ভাইস চাস্পেলের বাসায় চলে গেছে। আগামীকাল ভোর সাতটা পঁয়স্ত সময় আছে ভাইস চাস্পেলের বাসায় গিয়ে বাকশালে ভর্তি হওয়া। আমি মনে মনে অনিদিত্ত হলাম। স্যারকে বলতে পারব চেষ্টা করেছিলাম।

আমরা তখন থাকি বাবর রোডের একটা পরিত্যক্ত দোতলা বাড়ির একতলাম। সরকার শহীদ পরিবার হিসেবে আমার মাকে সেখানে বাস করার অনুমতি দিয়েছিলেন।

এই নিয়েও লক্ষ কাও। এক রাতে রক্ষীবাহিনী এসে বাড়ি ঘেরাও করল। তাদের দাবি—এই বাড়ি তাদের বরাবর দেওয়া হয়েছে। রক্ষীবাহিনীর কর্মকর্তা এখনো থাকবেন। মা শহীদ পরিবার হিসেবে বাড়ি বরাবর পাওয়ার চিঠি দেখালেন। সেই চিঠি তাঁর মায়ের মুখের উপর ছুঁড়ে ফেলল। এরপর তখন হলো তাজে।

লেপ-তোষক, বইপত্র, রান্ধার হাঁড়িকুড়ি তাঁর রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলতে শুরু করল। রক্ষীবাহিনীর একজন এসে মায়ের মাথার উপর রাইফেল তাক করে বলল, “এই মুহূর্তে বাড়ি ছেড়ে বের হন, নয়তো গুলি করব।” মা বললেন, “গুলি করতে চাইলে গুলি করুন। আমি বাড়ি ছাড়ব না। এত রাতে আমি ছেলেমেয়ে নিয়ে কোথায় যাব ?”

আমার ছেটাভাই জাফর ইকবাল তখন মায়ের হাত ধরে তাকে রাস্তায় নিয়ে এল। কী আশ্র্ম দশ্য ! রাস্তায় নদীমার পাশে অভূত একটি পরিবার বসে আছে। সেই রাতেই রক্ষীবাহিনীর একজন সুবাদার মেজের ওই বাড়ি একতলাম দখিল হলেন। পরিবার-পরিজন নিয়ে উঠে পড়লেন।

একটি শহীদ পরিবারকে অপমানের হাত থেকে রক্ষা জন্যে দুজন মহৎপ্রাণ মানুষ প্রাণে এসেন। একজনের নাম আহমদ ছিল। তিনি ঘোঁষণা দিলেন, বঙ্গভূমের সামনে গায়ে কেরোসিন ঢেলে তিনি আজ্ঞাহতি দেবেন। তিনি একটিন কেরোসিন কিনে অনলেন।

শহীদী ব্যক্তিটি হচ্ছেন মাসিক সাহিত্য পত্রিকা সমকালের সম্পাদক সিকন্দর আবু জাফর।

দুজনের চেষ্টার ওই বাড়ির দোতলার দুইমাস পরে আমরা উঠাম। একতলাম রক্ষীবাহিনীর সুবাদার। তিনি কঠিন বৈতানিক ধরলেন।

আমাদের বাড়ির ছাদটা ছিল আমার খুব পছন্দের। সকাল পঁর ছাদে হাটতাম। পাটি পেতে শুরু থাকতাম। আকাশের তাঁরা দেখতাম।

রক্ষীবাহিনীর সুবাদার সাহেবের একদিন ঘোঁষণা করলেন, এই বাড়ির ছাদ তার দখলে। আমরা কেউ ছাদে যেতে পারব না। আমাদের বাজি হওয়া ছাড়া আর কোনো পথ ছিল না। আমার ছাদ-স্রষ্ট বন্ধ হয়ে গেল।

আমরা যে বাড়িতে থাকতাম, তাঁর পানির নল সব ভাঙ্গ ছিল। পাইপে করে একতলা থেকে পানি আনার ব্যবস্থা ছিল। সেটাও নির্ভর করত সুবাদার সাহেবের মর্জিন উপর। কেনে কোনো দিন তিনি পানির সাপ্তাহিক বন্ধ করে দিতেন। আমাদের পানি ছাড়াই চলতে হতো। শান বন্ধ।

আমাদের বাড়ি থেকে সামান্য দূরে পরিত্যক্ত বিশাল এক তিনতলা বাড়িতে দলবল নিয়ে থাকতেন বঙ্গবাসীর কাদের সিদ্ধিকী। রক্ষীবাহিনী আমাদের রাস্তায় বের করে দেওয়ার পর সাহায্যের আশার আমি তাঁর কাছেও গিয়েছিলাম। তিনি অতি তুঁচ বিষয়ে তাঁকে বিরক্ত করার অভিজ্ঞ স্কুল হয়েছিলেন। মহা বিপদে মানুষ খড়কুটা ধরে, আমি বঙ্গবাহিনীকে ধরতে গিয়ে দেখি তিনি খড়কুটা মাতোই।

সেই সময় ঢাকা শহরে উজ্জবের অস্ত ছিল না। একটা অধ্যাপক ওজন হলো—সরকারের নির্মল বাহিনী কাজ করছে। সম্ভেদভাজন ঘূরক ছেলেদের ধরে ধরে নিয়ে যায়, তারপর আর তাদের ধোঁজ পাওয়া যায় না। এই উজ্জবের কিছু সত্যতা থাকতেও পারে।

সেই সময় নিজেকে নিয়ে আমি খুব ভীত ছিলাম। রাতে ঘুমাতে যাওয়ার সময় আমার মনে হতো, এই বুবি দরজায় কড়া নড়বে। আমাকে ধরে নিয়ে যাবে। শেখ কামালের নামে ভৱিত্ব সব উজ্জবে বিংবা বটনা প্রচলিত ছিল। এর একটি ব্যাক-ডাকাতি বিষয়ক। আমি এই উজ্জবে তখনো বিশ্বাস করি নি, এখনো করি না। সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী প্রধানমন্ত্রীর ছেলেকে বাড়তি আর্থের জন্যে ডাকাতি করার প্রয়োজন পড়ে না। দুঃখের সঙ্গে বলছি, সেই সময় নিজ দেশে আমাকে মনে হতো পরবাসী। দেশটাকে বুরতেও পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল দেশের এন্ট্রাপি শুষ্কই বাঢ়ছে। ধার্মেডিনামিসের ষষ্ঠীয় সুত্র—এন্ট্রাপি হলো বিশ্বজ্ঞানের মাপ।

যুক্তিপ্রাপ্ত একটি দেশকে টিকঠাক করে তুলতে স্বাই সাহায্য করাবে—এটাই আশা করা হয়, এটাই স্বাভাবিক। বালাদেশে তখন অস্বাভাবিকের রাজত্ব। সব দল বর্ষার কই মাজের মতো উজিয়ে গেছে। মাঠে নেমেছে সর্বহারা দল। বেহেতু তারা সর্বহারা, তাদের আর কিছু হারাবার নেই। তারা নেমেছে শ্রেণীশক্ত খতমে। তাদের প্রধান শক্তি আওয়ামী সীগ। পত্রিকার পাতা উটালেই সর্বহারার হাতে নিহত আওয়ামী সীগ নেতাদের ছবি পাওয়া যায়। সর্বহারা দলের প্রধান সিরাজ সিকদার। তিনি ধরাছেমার বাইরে।

সর্বহারাদের সঙ্গে পাত্রা দিয়ে নেমেছে জাতীয় সমাজতাত্ত্বিক দল। তারা বালাদেশকে বললে দেবে। বালাদেশ হবে সমাজতাত্ত্বিক দেশ। বিশেষ ধরনের এই সমাজতাত্ত্বিক কার্যে শ্রেণীশক্ত খতম দিয়ে শুরু করতে হয়। চলছে হত্যাকাণ্ড।

গোকুল বাড়তে রক্ষীবাহিনী। সাতারে তাদের বিশাল ক্যাম্প। ট্রেনিং-এ আছেন ভারতীয় সেজের রেডিত। রক্ষীবাহিনীর প্রশাকও ভারতীয় সেনাবাহিনীর মতো জলপাই রঞ্জে। এই বাহিনীর অফিসারার ট্রেনিং পেতেন ভারতের দেরাদুন ব্যাটল ফ্ল থেকে। রক্ষীবাহিনীর ‘ফরমেশন সাইন’ ছিল বঙ্গবন্ধুর সেই বিশ্বাস তর্জনি। এ থেকে মনে করা স্বাভাবিক বঙ্গবন্ধুর প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্যাই ছিল এই বাহিনীর মূলমন্ত্র। এটা স্বাভাবিকও ছিল, কারণ রক্ষীবাহিনীর সব সদস্যই ছিল প্রাক্তন মুজিব এবং কাদের বাহিনীর সদস্য।

আমি কাছপ স্বত্ত্বাবের মানুষ। বাহিনীর আঁচ পেলে খোলসের ভেতর চুকে বসে থাকতে পছন্দ করি। খোলসের ভেতর আবক্ষ থেকে দেশের সে সময়কার রাজানৈতিক বিশ্বেষণ আমার পক্ষে করা কঠিন। তারপরও মনে হয়, রক্ষীবাহিনী ছিল সামরিক বাহিনীর প্রতিপক্ষ। এই বাহিনী এফিলতাৰে সাজানো ছিল যে, অতি দ্রুত তাদের সামরিক বাহিনীর বিপক্ষে দাঢ়া কৰাবাবা যাব।

যখন সত্যিকার ধরোজন দেখা দিল তখন রক্ষীবাহিনীর টিকির দেখাও পাওয়া গেল না। অল্পকিছু সেনা সদস্যের বিদ্রোহ দমন তাদের কাছে কোনো ব্যাপারই ছিল না। বরং তারা উটোটাই

করল। সামানে রাজ্বীবাহিনীর সঙ্গে তখন ছিলেন
বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সচিব তোকারেল আহমেদ।
রাজ্বীবাহিনী তোকারেল আহমেদকে নিম্নোক্ত করতে
হবে জনতে চেয়ে বাবুর বিদ্রোহীদের কাছে খবর
পাঠাতে লাগলেন। তাঁটা একক যে আমরা
ইঙ্গিতের অপেক্ষা। ইঙ্গিত পেলেই বিদ্রোহী
সরকার যা করতে বলতে করল। বাদা হাজির।

রাজনীতির কচকচানি থাকুক, নিজের কথা
বলি। আমি তখন চরম অর্থনৈতিক সমস্যার ভেতর
দিয়ে যাচ্ছি। আমার স্বেচ্ছা এবং বাবুর প্রেরণারের
সামান্য (চুক্ষণ) টাকা গোটা পরিবারের সকল।
মাসের শেষের দিকে মা বের হন ধার করতে। মার
পরিচিতজনরা তাঁকে দেখলেই আতঙ্কিত বোধ
করেন।

গোদের উপরে ক্যাসারের মতো অর্থোজনীয়
মেহমান আমাদের বসার ঘর আলো করে বসে
থাবেন। এদের একজন কাইয়ুম ভাই। তিনি
অসাধারণ সেবারী ছাত্র ছিলেন। রাজশাহী নোর্ডে
এসএসসি পরীক্ষায় থার্ড হয়েছিলেন। ঢাকায় পড়তে
এসে তাঁর ব্রেইনে গিয়ে দুঃখ দেয়ে গেল। পড়াশোনা বাদ
দিয়ে তিনি ইসলামি সেবাস গায়ে তুলে নিলেন।
দাঢ়ি রাখলেন। চোখে সুরমা দেওয়া শুরু করলেন।
ধৰের প্রতি প্রবল আসক্তি থেকে কোনো ব্যবসেই
আসতে পারে। এটা দেবীয়ার না। দেবীয়া
হলো—তাঁর মা-বাবা ঢাকায় থাকেন। কাইয়ুম ভাই
নিজের বাসা ছেড়ে ভোরবেলো আমাদের বাবুর
রোডের বাসায় চলে আসতেন। নাস্তা থেকেন,
দুপুরের খাবার থেকেন, রাতের ভিনার শেষ করে
নিজের বাসায় থেকেন। পরদিন ভোরে আবুর
উপস্থিতি। থেকে বসে আর সময়ই বলতেন,
খাবারের মাল আরেকটু উন্নত হওয়া আয়োজন।

চালের অস্বাভাবিক মূল্যবৃক্ষের কারণে বাসায়
রাতে কুটি খাওয়া হতো। শুকনো কুটি কাইয়ুম
ভাইয়ের গলা দিয়ে নামে না বিধায় তাঁর জন্যে ভাত
করা হতো।

ছিতীর বে মেহমান দ্রুয়িৎক্ষমে মাঝে মাঝে এসে
বসে থাকত, তাঁর সঙ্গে আমি ঢাকা কলেজে পড়েছি।
সুদর্শন রঞ্জবন শুরুক। সবসময় ইংরেজিতে কথা
বলত বলে কলেজে তাঁর নাম ছিল 'ইঙ্গিশম্যান'।
ঢাকা কলেজে পড়ার সময় তাঁর পুরোপুরি মাথা
খারাপ হয়ে যায়। তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল হ্যার।

ঢাকা নিশ্চিবিদ্যালয়ে মাটোরি শুরু করেছি।
আমার দায়িত্ব কার্য ইয়ারের ছাত্রদের স্বাইচ কর্মের

ব্যবহার শেখানো। হঠাতে দেখি ঝালে মাথা নিচু
করে ইঙ্গিশম্যান বসে আছে। আমি অবাক হয়ে
বললাম, তুমি ইঙ্গিশম্যান না?

সে উঠে দাঢ়াল। মাথা নিচু করে বলল, Yes
Sir.

আমি বললাম, তুমি আমাকে স্যার বলছ কেন?
তুমি আমার বুকু।

সে বলল, Now you are my respected
teacher.

তাঁর কাছে ভুলাম অনেকদিন মাত্রিকবিকৃতি
রোগে ভুগে এখন সে সুস্থ হয়েছে। আবার
পড়াশোনা শুরু করেছে।

আমি তাঁকে বাবুর রোডের বাসায় নিয়ে
গেলাম। তাঁর জন্যে আমি অত্যন্ত বাধিত বোধ
করছিলাম। তাঁকে বললাম, পড়াশোনার সবরকম
সাহায্য আমি করব। আমাকে সার ভেকে দে মেন
লজ্জা না দেয়। আগে মেভাবে হুমায়ুন ডাকত
এখনো তা-ই ডাকবে।

তিনি থেকে চার মাস ঝালস করার পর আবার
সে পাগল হয়ে গেল। একদিন হতভুর হয়ে দেখি,
সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় সে ইউনিভার্সিটিতে এসেছে।
রসায়ন বিভাগের প্রতিটি কক্ষেই সে তুকে ব্যাকুল
হয়ে বলছে, হুমায়ুন কোথায়? হুমায়ুন? My
friend and my respected teacher হুমায়ুন?

সে শুধু রসায়ন বিভাগে না, বাবুর রোডে
আমার বাসাতেও হানা দিতে শুরু করল। সঞ্চাহে
নাই থেকে তিনি দিন সে আসেছে। একটি শুরুক
ছেলে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে বসার ঘরে সারা দিন বসে
আছে। ভয়কর দৃশ্য।

শুধু একজন বিষয়টাকে স্বাভাবিকভাবে নিতেন,
তিনি কাইয়ুম ভাই। জাপা জোকা পরা মাত্তলা,
পাশে নগ্ন ইঙ্গিশম্যান। কাইয়ুম ভাইয়ের ভাবতদি
থেকে মানে হতো বিষয়টা স্বাভাবিক।

১৪ আগস্ট বৃহৎপত্তিবার। ইউনিভার্সিটিতে কোনো
ক্লাস ছিল না। হেঁটে হেঁটে বাবুর রোডের বাসায়
এসেছি। অর্থ সাম্রাজ্যের চেষ্টা। আমি রোগাভোগ
হওয়ার কারণে বাসে টেলাটেলি করে কখনো উঠেতে
পারি না। রিকশা নেওয়ার প্রশ্নই আসে না। বাসায়
তুকে দেখি, কাইয়ুম ভাই এবং ইঙ্গিশম্যান
পশাপাশি বসা। ইঙ্গিশম্যান ব্যারীতি নগ্ন।
কাইয়ুম ভাই বললেন, হুমায়ুন, তোমরা তরকারিতে

বেশি বাল দাও। আমি এত বাল খেতে পারি না।
তোমার মাঁকে আমার জন্যে কম বালের তরকারি
বাধতে বলবে।

আমি দীর্ঘ নিষ্পাস ফেললাম। একবার ভাললাম
বলি, অনেক ব্যর্ণ করেছেন। এখন আমাদের শুক্রি
লিন। বলতে পারলাম না। মৌলনের শুক্রতে আমি
অনেক ভদ্র, অনেক বিনয়ী ছিলাম।

ইঙ্গিশম্যান আমাকে দেবেছি উঠে দাঢ়িয়ে
পড়েছিল। মনে হয় শিক্ষকের প্রতি সম্মত দেখিয়ে
দাঢ়িয়ে। কাইয়ুম ভাইয়ের কথা শেষ হওয়ামাত্র সে
গলা নামিয়ে বলল, হুমায়ুন, আমাকে একটা প্যান্ট
দাও। কিছুক্ষণ আগে তোমার ছেটবেল শিখ উঠি
দিয়েছিল। তাকে দেখার পর থেকে লজ্জা লাগছে।
একটা প্যান্ট দাও। প্যান্ট পরে চলে যাব।

আমার তখন দুটামাত্র প্যান্ট। একটা দিয়ে
দেওয়া মানে সর্বমাত্র। তারপরেও প্যান্ট এমন তাকে
পরালাম। সে ইংরেজিতে বলল, তুমি আমার
একমাত্র বুকু। আমার আর কেউ নাই। এইজন্যে
তোমাকে একটা খবর দিতে এসেছি। গোপন খবর।
কেউ জানে না শুধু আমি জানি। পুরাপুরি পাগল
হলে গোপন খবর পাওয়া যায়। খবরটা হচ্ছে,
আগামী কাল থেকে রক্তের নদী—River full of
fresh blood. Blood blood and blood কার
কর দিয়ে শুরু হবে তা জনতে চাও? জনতে
চাইলে তোমাকে বলব আর কাউকে বলব না।
মাছিকেও বলা যাবে না।

আমি বললাম, জনতে চাই না।

পাগল ধলাপ বলব আর কোনো শুরুত্ব দেওয়ার প্রশ্ন উঠে না।

ইঙ্গিশম্যান গলা নিচু করে বলল, হুমায়ুন,
সাবধানে থাকববে।

আজ্ঞা থাকব।

দুরজা জামালা শুরু করে খাটোর নিচে শুরু
থাকবে।

আমি বললাম, আজ্ঞা থাকব।

ইঙ্গিশম্যান প্যান্ট পরে ঘর থকে বের হলো।
আমাদের বাসা পার হওয়ার পর পর প্যান্ট খুলে
ছাড়ে ফেলে নগ্ন হয়ে আবার হাটিতে শুরু করল।
তাঁর পিছু নিল কয়েকটা কুকুর। তাঁরা যেট থেকে
করছে, ইঙ্গিশম্যানকে কামড়ানোর ভঙ্গি করছে।
ইঙ্গিশম্যান ফিরেও তাকাচ্ছে না। পাগলরা কুকুর
তা পায় না তা জনতাম না। প্রথম জামালাম। ○

হরিদাসের চুল কাটার দোকান সোনাহানবাগে। তার দোকানের একটি সামনেই ধানমণি বগ্রিশ
নবর রোডের মাথা। সঙ্গতকারণেই হরিদাস তার সেলুনে সাইনবোর্ড টালিয়ে রেখেছে—

শেখের বাড়ি সেই পথে

আমার সেলুন সেই পথে।

সাইনবোর্ডের লেখা পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তবে হরিদাস পথচারীদের জন্যে
এই সাইনবোর্ড টালান নি। তার মনে ক্ষীণ আশা কোনো একদিন এই সাইনবোর্ড বঙ্গবন্ধুর
নজরে আসবে। তিনি গাড়ি থেকে সেমে এগিয়ে আসবেন। গঁষ্টীর গলার বলবেন, সেলুনের
সাইনবোর্ডে কী সব ছাতা-মাথা লিখেছিস। নাম কী তোর? দে আমার চুল কেটে দে। চুল
কাটার পর মাথা মালিশ।

বঙ্গবন্ধুর পক্ষে এ ধরনের কথা বলা মোটেই অসাভাবিক না, বরং সাভাবিক। সাধারণ
মানুষের সঙ্গে তিনি এমন আচরণ করেন বলেই তার টাইটেল বঙ্গবন্ধু।

হরিদাস চুল কাটার ফাঁকে খন্দের বুরো বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গঢ়ে ফাঁদে। খন্দেরা
বেশির ভাগই তার কথা বিশ্বাস করে। হরিদাস কেঁচি চালাতে চালাতে বলে, “আমার কথা
বিশ্বাস করবেন কি না জানি না। যে কেঁচি দিয়া আপনের চুল কাটতেছি সেই কেঁচি দিয়া
ব্যবহৃত বঙ্গবন্ধুর চুল কেটেছি। তাও একবার না, তিনি বার। প্রথমবারের ঘটনাটা বলি,
চেত্রমাসের এগারো তারিখ। সময় আনুমানিক এগারোটা...”

পনেরোই আগষ্ট শেষ রাতে হরিদাস তার দোকানে ঘুমাইল। হঠাৎ ঘুম ভাঙল, মড়মড় শব্দ
হচ্ছে—দোকান ভেঙে পড়ছে। হরিদাস ভুমিকম্প হচ্ছে ভেবে দোকান থেকে বের হয়ে
হতভস্ত। এটা আবার কী?

আলিশন এক ট্যাংক তার দোকানের সামনে ফুরাছে। ট্যাংকের ধাক্কার তার দোকান
ভেঙে পড়ে যাচ্ছে। ট্যাংকের ঢাক্কা খেলা। দুজন কালো পোশাকের মানুষ দেখা যাচ্ছে।
দোকান ভেঙে ফেলার জন্য কঠিন কিছু কথা হরিদাসের মাথায় এসেছিল। সে কোনো কথা
বলার আগেই ট্যাংকের পেছনের ধাক্কায় পুরো দোকান তার মাথায় পড়ে গেল। পনেরোই
আগষ্ট হত্যাকাণ্ডের সূচনা করল হরিদাস।

চাকা মসজিদের শহর। সব মসজিদেই কজনের আজান হয়। শহরের দিন শুরু হয়
মধুর আজানের ধানিতে। আজান হচ্ছে, আজানের ধনির সঙ্গে নিতান্তই বেমানান কিছু কথা
বঙ্গবন্ধুকে বলছে এক মেজর, তার নাম মহিউদ্দিন। এই মেজরের হাতে চেনগান। শেখ
মুজিবের হাতে পাইপ। তার পরামে সাদা পাঞ্জাবি এবং ধূসর চেক লুঙ্গি।

শেখ মুজিব বললেন, তোমরা কী চাও? মেজর নিব্রত ভঙ্গিতে আমতা-আমতা করতে
লাগল। শেখ মুজিবের কঠিন বাক্তিতের সামনে দাঁড়ায়ে থাকা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে
পড়েছিল। শেখ মুজিব আবার বললেন, তোমরা চাও কী?

মেজর মহিউদ্দিন বলল, স্যার একটি আসুন।

কোথায় আসুন?

মেজর আবারও আমতা-আমতা করে বলল, স্যার একটি আসুন।

শেখ মুজিব বললেন, তোমরা কি আমাকে খুন করতে চাও? পাকিস্তান সেনাবাহিনী যে
কাজ করতে পারে নি সে কাজ তোমরা করবে?

এই সময় স্বর্ণক্ষেত্র অন্তর্ভুক্ত হাতে ছুটে এল মেজর নূর। শেখ মুজিব তার দিকে ফিরে

তাকামোর আগেই সে ত্রাশকায়ার করল। সময় ভোর পাঁচটা চারিশ। বঙ্গ-পিতা মহামানব শেখ মুজিব সিঁড়িতে চুটিয়ে পড়লেন। তখনো বঙ্গবন্ধুর হাতে তার পিয়া পাইপ।

বঙ্গ নৱৰ বাড়িটিতে কিছুক্ষণের জন্মে নৱকের দরজা খুলে পেল। একের পর এক রক্তেজা মানুষ দেখেতে চুটিয়ে পড়লে লাগল।

বঙ্গবন্ধুর দুই পুত্রবন্ধু তাদের মাঝখানে রাসেলকে নিয়ে বিছানার জড়াজড়ি করে শয়ে থরথর করে কাপছিল। ঘাতক বাহিনী দরজা ভেঙে ভেঙে চুকল। ছেট রাসেল দোড়ে অশ্রু নিল আলনার পেছেন। সেখান থেকে শিশু করুণ গলায় বলল, তোমরা আমাকে উলি করো না।

শিশুটিকে তার লুকানো জয়গা থেকে ধরে এনে উলিতে ঝাঁকাড়া করে দেওয়া হলো। এরপর শেখ জামাল এবং শেখ কামালের মাঝ কিছুদিন আগে বিয়ে হওয়া দুই তরুণী বধকে হত্যার পদ্ধা।

মন্ত্রী সেরনিয়াবত (বঙ্গবন্ধুর ভগিনীপতি) এবং শেখ মণি (বঙ্গবন্ধুর ভাণ্ণো) বাড়িও একই সঙ্গে আক্রমণ হলো। সেখানেও রক্তগঙ্গা। শেখ মণি মারা গেলেন তাঁর অস্তসন্তা স্তৰীর সঙ্গে, পিতামাতার মহ্যদৃশ্য শিশু তাপস দেখে খাটোর নিচে বসে। এই শিশুটি তখন কী তাবছিল? কেবিনেট মন্ত্রী সেরনিয়াবত মারা গেলেন তাঁর দশ-পন্থের বছরের দুই কল্যা, এগারো বছর বয়লী এক পুরু এবং মাত্র পাঁচ বছর বয়লী এক নাতির সঙ্গে।

সকাল সাটাটা

বালাদেশ বেতার ফ্রন্টন একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করছে। উন্নিসিং গলায় একজন বলছে, “আমি ডালিম বলছি। হৈরাচারী মুজিব সরকারকে এক সেনাভূত্যাকের মাধ্যমে উৎখাত করা হয়েছে। সারা দেশে মার্শাল ‘ল’ জারি করা হলো।”

দেশ থমকে দাঙ্গল।

কী হচ্ছে কেউ জানে না। কী হতে যাচ্ছে তা ও কেউ জানে না।

মানুমের আস্তার মতো দেশের আস্তা ও থাকে। কিছু সময়ের জন্মে বালাদেশের আস্তা দেশ ছেড়ে গেল।

মেজের জেলারে জিয়া বঙ্গবন্ধু হত্যার থবর উন্ন নির্বিকার ভঙ্গিতে বললেন, প্রেসিডেন্ট নিহত তাতে কী হয়েছে? ভাইস প্রেসিডেন্ট তো আছে। কল্পনিটিউশন মেল ঠিক থাকে।

বঙ্গবন্ধুর অতি কাছের মানুষ রাজনৈতিক সচিব তোকামোল আহমেদ—বলে আছেন রক্ষীবাহিনীর সদর দপ্তর স্বাভাবে। আতকে তিনি অস্ত্রিত। রক্ষীবাহিনী আস্তসমর্পণ করে তাকে নিয়ে পড়েছে। তারা বারবার জলতে চাষে তোকামোল আহমেদকে নিয়ে কী করবে? বঙ্গবন্ধুকে বক্ষের দায়িত্বে নিয়োজিত বিশেষজ্ঞ রক্ষীবাহিনী বিয় ধরে বসে আছে। এক ঘায়রার

সাহসী তেজি ছাত্রনেতা তোকামোল আহমেদও বিয় ধরে আছেন। শুরু হয়েছে বিয় ধরার সময়।

সকাল-নকারা কার্য দেওয়া হয়েছিল। বিকেনের দিকে বিভিন্ন গলিতে কিছু মানুষ ইটাইটি শুরু করল। সাহসীদের কেউ কেউ রাস্তায় বের হলো। তাদের একজন শফিক। তার মানে ক্ষীণ আশা—কেউ না কেউ এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করবে। রাস্তায় মিছিল বের হবে।

রাস্তায় মিছিল বের হয়েছে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, সেই মিছিল অনেক মিছিল।

শফিক বাল্লা মোটর পিয়ে এক অস্তুত দশ্য দেখল। সেখানে রাখা ট্যাঙ্কের কামানে ফুলের মালা পরানো। কিছু অতি উৎসাহী ট্যাঙ্কের উপর উঠে নাচের ভঙ্গি করছে।

আমার বালর রোডের বাসার কথা বলি, বেতারে বঙ্গবন্ধুর মহ্যর থবর প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে একতলায় রক্ষীবাহিনীর সুবাদার পালিয়ে পেলেন। তার দুই মেরে (একজন গর্ভবতী) ছাটে এল মার্ব কাছে। তাদের অশ্রু দিতে হবে। মা বললেন, তোমাদের অশ্রু দিতে হবে কেন? তোমরা কী করেছ? তারা কাঁদে কাঁদে গলায় বলল, খালায় এখন পাবলিক আমাদের মেরে ফেলবে।

এই ছেট ঘটনা থেকে রক্ষীবাহিনীর অত্যাচার এবং তাদের উপর সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রেও ঘৃণাও টের পাওয়া যায়।

সকামোলা শফিক এসেছে অবক্ষিদের বাড়িতে। অবক্ষি বলল, স্যার আপনি আজ কেন এসেছেন! দেশে ভয়ঙ্কর অবস্থা আর আপনি সকামোলা চলে এসেছেন।

শফিক থতমত থেকে বলল, তোমাদের খোজ নিতে এসেছি।

অবক্ষি বলল, আমরা ভালো আছি। আপনি এক্সুনি বাসায় চলে যান।

শফিক বলল, আস্তা।

অবক্ষি বলল, থাক আপনাকে যেতে হবে না। পথে কেন বিপদ ঘটবে কে জানে! আপনি থেকে যান। প্রেটকম গোছানোই আছে। সেখানে দাখিল হয়ে যান।

শফিক বলল, তোমার দানু রাগ করবে। উনি আমাকে পছন্দ করেন না।

অবক্ষি বলল, দানু পছন্দ করবেন বলে এই বিপদে আপনাকে ছেড়ে দেব!

সরকারীজন খান শফিককে দেখে রাগ করলেন না বরং খুশি হলেন। আগ্রহ নিয়ে বললেন, সাধারণ মানুষের রিঅ্যাকশন কী বলো। তার আগে তোমার রিঅ্যাকশন বলো।

শফিক বলল, ভয়ঙ্কর এক ঘটনা ঘটেছে। ভয়ঙ্কর এবং অবিশ্বাস্য। বঙ্গবন্ধুর পাশে কেউ দাঙ্গল না—এটা আমি মেনে নিতেই পারছি না।

কেউ তার পাশে দাঙ্গল নি এটা ঠিক না। কর্নেল শাফিয়েত জামিল ছাটে গিয়েছিলেন। বিদ্রোহীদের প্রতিতে মারা গেছেন।

শফিক বলল, কেউ তার পক্ষে রাস্তায় বের হয়ে কিছু বলবে না?

সরকারজন খুলেন, সাহস আছে রাস্তায় দাঙ্গিলে চিকিৎসক করে বলার—“মুজিব হত্যার বিচার চাই।”

শফিক বলল, আমার সাহস নেই। আমি খুবই ভালু মানুষ। কিছু আমি বলব।

কবে বলবে?

আজ রাতেই বলব।

রাত আটটা। মনে হচ্ছে পরিষ্কৃতি স্বাভাবিক হয়ে আসছে। বৌদ্ধকর মৌশতাকের নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠিত হয়েছে। তিনি বাহিনী প্রধান নতুন সরকারের প্রতি অনুগত্য দেখান। পুরোনো মন্ত্রিভার থার সবাইকে নিয়েই নতুন মন্ত্রিসভা তৈরি হয়েছে। নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা যুক্ত হয়েছেন।

মনে হচ্ছে পুরোনো আওয়ামী লীগই আছে ওধু শেখ মুজিবুর রহমান নেই। কী অস্তুত কথা!

জননেতা মণ্ডলানা ভাসানীও কিছুদিনের মধ্যেই নতুন সরকারকে সমর্থন দিলেন।

একজন অবশ্যি প্রতিবাদ করলেন। কঠিন প্রতিবাদ করলেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর কানের সিদ্ধিকী। তিনি বঙ্গবন্ধুর আচরণই করলেন। দেশ ছেড়ে তারতে চলে গেলেন। মুজিবিহীন বালাদেশে বাস তার জন্যে অসম্ভব মনে হলো।

আরেকজনের কথা অবশ্যই বলতে হবে। তিনি অভিনেতা আবুল খায়ের। তখন একত্রিতির এসডি ছিলেন। তিনিও দেশ ত্যাগ করলেন।

পনেরোই আগষ্ট রাত ন টার দিকে। সরকারজন খানের বাড়ির সামনে রাস্তায় এক মুবককে চিকিৎসক করতে করতে সড়কের এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত মুক্ত দেখা গেল। সে চিকিৎসক করে বলছিল—মুজিব হত্যার বিচার চাই। মুবকের পেছনে পেছনে বাজ্জিল ভয়ঙ্কর দর্শন একটি কালো কুকুর।

সেই রাতে অনেকেই রাস্তার দুপাশের ঘরবাড়ির জানালা খুলে অনেকেই মুবককে আগ্রহ নিয়ে দেখছিল। সঙ্গে সঙ্গে জানালা বক্ষও করে মেলছিল।

আচমকা এক অর্মির গাড়ি মুবকের সামনে এসে ত্রুক করল। গাড়ির ডেতর থেকে কেউ একজন মুবককে মুখে টর্চ ফেলল। টর্চ সঙ্গে সঙ্গে নিভো ইংরেজিতে বলল, Young man go home try to have some sleep.

শফিককে এই উপদেশ দিলেন, তিনি ত্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ।